আল-ক্বাদিসিয়াহ মিডিয়া

পরিবেশিত

শাইখ উস্তাদ ইয়াসিরের

সাথে

আস্-সাহাব মিডিয়ার সাক্ষাৎকার

অনুবাদঃ আল-ক্বাদিসিয়াহ মিডিয়া

[তথ্যঃ শাইখ ইয়াসিরকে আবারও গ্রেফতার করা হয়েছে এবং এই অনুবাদ করা অবধি তাকে মুক্তি দেওয়া হয়নি। আমরা আল্লাহর কাছে তাঁর দৃঢ়তা এবং দ্রুত মুক্তি কামনা করছি।]

একজন ইতালিয়ান বন্দীর বিনিময়ে তাঁর মুক্তি লাভের পর শাইখ উস্তাদ ইয়াসিরের সাথে প্রথম সাক্ষাৎকার (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন)।

শাইখ উস্তাদ ইয়াসিরের জীবনীঃ

- শাইখ মুহাম্মাদ ইয়াসির। উস্তাদ ইয়াসির নামে পরিচিত।
- ১৯৫৩ ইংরেজি সাল আর ১৩৭৫ হিজরিতে কাবুলে জন্ম।
- ১৩৭৭ হিজরিতে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে উত্তীর্ণ হন।
- পাকিস্তানে হিজরত করেন ১৩৯৪ হিজরিতে।
- একই বছরে তিনি মদিনার ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহীত হন এবং ১৩৯৯ হিজরিতে স্নাতক হন।
- আফগান জিহাদে একজন নেতা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন; যা ১৩৯৫ হিজরিতে তাঁর শিক্ষাজীবনে শুরু হয়েছিল।
- আফগান জিহাদের সময় ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে তিনি কাজ করেন।
- জিহাদ চলাকালীন ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়াহ এবং সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
- জিহাদের সময় ইসলামিক ইউনিয়নের রাজনৈতিক কমিটির সভাপতি হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন।
- আহমেদ শাহ মাসুদ সরকারের আমলে তথ্য মন্ত্রি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
- মুজাদ্দিদি সরকারের আমলে উন্নয়ন মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
- রব্বানী সরকারের আমলে উন্নয়ন মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
- বিভিন্ন মহলের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে তিনি মন্ত্রি পদ থেকে পদত্যাগ করেন।
- পেশাওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের আক্বীদা বিভাগে দাওয়াহ এবং জিহাদ বিষয়ে শিক্ষকতা করেন।
- তালিবান আন্দোলন গঠনের পর তার সমর্থন করেন।
- ম্যানহাটন আক্রমণের পর তিনি তালিবানদের সাথে যোগ দেন এবং জিহাদের বাধ্যবাধকতার জন্য অন্য সবকিছু ত্যাগ করেন।
- ইসলামিক রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
- দাওয়াহর উপর তাঁর শত শত অডিও বক্তৃতা আছে।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি, সকল প্রশংসা তাঁর যিনি সমগ্র কিছুর মালিক। সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রেরিত বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ -এর উপর, তাঁর পরিবার এবং কেয়ামত অবধি তাঁর সকল সাথীগণের উপর।

উস্তাদ মুহাম্মাদ ইয়াসিরের কারা মুক্তির পর তাঁর সাথে প্রথমবারের মতো সাক্ষাৎ করতে পেরে আস-সাহাব সম্মানিত বোধ করছে।

প্রশ্ন ১ঃ আমাদের শাইখ, আল্লাহ আপনাকে গ্রহণ করুন! আল্লাহ আপনাকে গ্রহণ করুন এবং সম্মানিত করুন। প্রথমেই আপনাকে কারারুদ্ধ করার বিষয়ে জানতে চাইবো। এখানে পাকিস্তানের ভূমিকা কি ছিল এবং কাবুল সরকার আপনার কাছে কি দাবি করছিল?

উস্তাদ ইয়াসিরঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য, যিনি যা কিছুর অস্তিত্ব আছে তা সব কিছুর মালিক। এবং শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক রসূলদের নেতা, তাঁর সমস্ত পরিবারবর্গ এবং সাথীদের উপর।

অতঃপর

প্রথমেই আমি আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো আপনার সাথে এবং আপনার মাধ্যমে যারা আমার কণ্ঠ শুনবে তাদের সাথে আমাকে কথা বলতে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আমি সমস্ত মুজাহিদীনদের, বিশেষ করে আমির-উল-মুমিনীন (ঈমানদারদের নেতা) মোল্লা মুহাম্মাদ উমর (আল্লাহ্ তাঁকে রক্ষা করুন) মুজাহিদ এবং মুজাহিদীনদের অন্যান্য নেতাদেরকে আমার অভিবাদন জানাচ্ছি, তাঁরা যেখানেই থাকুক না কেন, ট্রেঞ্চে বা বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে। আমি আমার সেই সমস্ত কারাবন্দী ভাইদের অভিবাদন জানাচ্ছি যাদেরকে আমি তাগুতদের (মুরতাদ সরকার) কয়েদখানায় ফেলে এসেছি। আমি অভিবাদন জানাচ্ছি তাদের সবাইকে যারা দাওয়াহ আর জিহাদের মাঠে কাজ করছেন, তাঁরা যেখানেই অবস্থান করুন না কেন। আমি তাঁদের সবাইকে বলছি, *আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহ*। আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল পেশাওয়ারের নিকটবর্তী শহর নাওশেরার শরণার্থী শিবিরের কাছ থেকে যেখানে আমি বাস করতাম। আমি আমার স্ত্রী আর সন্তানদের সাথে গাড়িতে ছিলাম। আমি ফেরারি ছিলাম না। আমি অনেক বছর ধরেই সেখানে আমার বাড়িতে বাস করছিলাম যেখানে আমি হিজরত করেছি। তারা আমাকে নাওশেরায় কারাবন্দী করে এবং তারপর ইসলামাবাদ কিংবা রাওয়ালপিন্ডিতে স্থানান্তর করে। আমি তিন মাসের জন্য পাকিস্তানে ছিলাম, এরপর তারা আমাকে কাবুলে স্থানান্তর করে।

কাবুলে তারা আপনার কাছ থেকে কি চেয়েছিল?

তিন মাস পর আমি যখন কাবুলে পৌঁছাই, সেটা ছিল রমাদানের ২২ তারিখ। তারা আমাকে একটি ব্যক্তিগত কক্ষ দিয়েছিলো এবং জিজ্ঞাসাবাদের সময় তারা আমার সাথে ভাল ব্যবহারই করেছিল। জিজ্ঞাসাবাদের কিছুদিন পর তারা আমাকে একটি প্রস্তাব দেয়। তারা বললো, "আপনি ঈদের রাত আপনার বাড়িতে কাটাতে পারেন। এক সপ্তাহ পরেই আপনি চলে যেতে পারেন, কিন্তু আমাদেরকে কথা দিন যে আপনি আমাদের বিরোধিতা করবেন না।" অধিকাংশ মুসলিমের জন্য এটা খুবই সহজে গ্রহণযোগ্য একটা প্রস্তাব। আমি বললাম, "আল্লাহর রসূল ﷺ রাজত্বের বিনিময়ে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি আর তুমি চাও যে আমি এটা কোন রকম বিনিময় ছাড়াই মেনে নেই?! আল্লাহর কসম! তুমি যদি আমাকে বিশ বছরও জেলে আটকে রাখ তবুও আমি এই প্রস্তাব কখনই গ্রহণ করব না। বরং, আমি তোমার কাছে আরও সহজ একটি প্রস্তাব রাখছি। আমাকে সেই অধিকার দাও যা আবু জাহল আল্লাহর রসূল ﷺ -কে দিয়েছিলো।" তারা জিজ্ঞেস করলো, "সে তাঁকে কি দিয়েছিলো?" আমি বললাম, "তারা হজ্বের মৌসুমে মানুষদের ইসলামের দিকে আহ্বান করার জন্য আল্লাহর রসূল ﷺ -কে অনুমতি দিয়েছিলো। এরপর তারা তাঁকে অনুসরণ করত আর তিনি যাদের সাথে কথা বলেছিলেন তাদেরকে বলত যে, "এই লোকটার কথা শুনো না! সে একটা পাগল!" আমি তাদেরকে বললাম, "আমাকে কথা বলতে দাও আর তারপর তোমরা আমাকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করতে পারো। আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করছি যে আমাকে কথা বলার স্বাধীনতা দাও, ইসলামের দিকে আহ্বান করার স্বাধীনতা দাও আর মিডিয়ার যে স্বাধীনতা নিয়ে তোমরা গর্ব কর তা দাও। আমাকে কথা বলার স্বাধীনতা দাও যাতে আমি কথা বলতে পারি আর লোকেরা তা শুনতে পারে।" তাদের জবাব কি

ছিলো? তারা টেলিভিশনের একজন কর্মীকে আমার সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য নিয়ে আসলো। আমি তাদেরকে বললাম, "তোমরা কি এটা সম্প্রচার করবে?" তারা বললো, "হ্যাঁ, কেন নয়?" আমি উত্তরে বললাম, "আমাকে কথা দাও যে তোমরা এটা বদলিয়ে ফেলবে না এবং এর পুরোটা সম্প্রচার করবে।" তারা বললো, "আমরা আপনাকে কথা দিচ্ছি।" সাক্ষাৎকারের পর তদন্ত বিভাগের প্রধান আমাকে বললো, "আপনি আপনার কাজ ভাল করেই করেন।" তারা সাক্ষাৎকারটি সম্প্রচার করেনি...তারা আমার কিছুই সম্প্রচার করেনি। কারাগারে আমার শেষ দিনটি পর্যন্ত আমি দাবি করেছিলাম যে তারা মিডিয়ার সামনে জনসম্মুখে আমার বিচার করুক, যাতে পুরো পৃথিবী আমাকে দেখতে এবং শুনতে পারে এবং আমি তোমাদের সাথে বিতর্ক করার জন্য প্রস্তুত।

তাদের উত্তর কি ছিলো?

তারা আজ পর্যন্ত উত্তর দেয়নি। তাই আজকে, আমি এই সুযোগে আবার তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ করছি। আমি তাদেরকে আমাকে কথা বলার স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য এবং আমাদেরকে পুরো পৃথিবীকে সম্বোধন করার এবং তাদের প্রতি সত্য কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বলছি।

শাইখ আল্লাহর ইচ্ছায়, আপনি যা চেয়েছিলেন তা আপনি পৌঁছে দিয়েছেন । তো এই হচ্ছে তা যা কাবুল সরকার আপনার কাছ থেকে দাবি করেছিল। পাকিস্তানের ভূমিকা কি ছিলো?

একজন ভৃত্য যে তার প্রভুর নির্দেশ পূরণ করে সে রকম ভূমিকা ছাড়া পাকিস্তান আর কোনো ভূমিকা পালন করেনি। তদন্তের সময় আমি তাদের সাথে তর্ক করছিলাম এবং তাদের কেউ কেউ আমাকে আগ থেকেই চিনতো এবং তাদের একজন পদস্থ কর্মকর্তা যে আমার সাথে বিতর্ক করছিল, আমি তাঁকে একটি প্রশ্ন করলাম। আমি জানতে চাইলাম যে, "আমি যখন রাশিয়ান এবং সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলাম তোমরা আমাকে পাকিস্তানের কূটনৈতিক পাসপোর্ট দিয়েছিলে এবং আমি সেই পাসপোর্ট দিয়ে ভ্রমণ করেছিলাম এবং হোয়াইট হাউসে একজন মন্ত্রি হিসেবে অতিথির অভ্যর্থনা পেয়েছিলাম। আমেরিকা আমাকে একজন মন্ত্রি এবং কূটনৈতিক হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তোমরা বলতে আমি একজন নায়ক, নেতা এবং মুজাহিদ। কিন্তু আমি যখন আমার দেশকে আমেরিকার দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত করতে চাই তখন আমাকে কেন সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে?" ওরা ওদের মানদণ্ড বদলিয়ে ফেলেছে। ওরা বললো, "আমাদেরকে ক্ষমা করুন। আমাদেরকে এই কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে এবং এই ব্যাপারে আমাদের কিছুই বলার নেই।"

পাকিস্তান এবং কাবুলে কারাবন্দী থাকার সময় পাওয়া আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলো কি?

১৯৭৪ থেকে ১৯৭৯ যখন তারাকি ক্ষমতায় আসলো এবং দাউদ সরকারের শাসনের সমাপ্তি ঘটলো, আমি একে দ্বিতীয় পর্যায় বলে মনে করি কারণ এসময় আমরা সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়াই সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলাম। তো এই পর্যায় পাঁচ বছরের মতো স্থায়ী হয়েছিল। হ্যাঁ, প্রায় পাঁচ বছর। ইসলামি আন্দোলনের যুবক এবং তাদেরকে যেসব আলিম সমর্থন করেছিলেন তাঁদের দ্বারা এই জিহাদ হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় অনেক কম ছিলেন এবং সাধারণত জনগণ তাঁদের সমর্থনে পাশে দাঁড়াতো না। তারা তাদের ভুল ধারণার কারণে আমাদেরকে মুজাহিদীন বলে মনে করতো না।এটি ছিল দ্বিতীয় পর্যায়; তৃতীয় পর্যায় ছিল জিহাদের যাকে আমরা আরও বিভিন্ন ধাপে ভাগ করতে পারি। প্রথম ধাপে ছিল সোভিয়েতদের আগমনের পূর্বে কমিউনিস্ট আফগানদের বিরুদ্ধে লড়াই; তারা ছিলো তারাকি, নূর মুহাম্মাদ আর শেষে হাফিজুল্লাহ আমিন। এটা প্রায় আড়াই বছরের মতো স্থায়ী হয়েছিল। এটি ছিল তৃতীয় পর্যায়। চতুর্থ পর্যায় ছিল সোভিয়েতদের আগমন, যখন কারমাল ক্ষমতায় আসে এবং তা চলে রাশিয়ানদের বিদায় নেওয়া পর্যন্ত। এটি ছিলো সেই পর্যায় যাতে সাধারণ জনগণ আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছিল। রাশিয়ানরা চলে যাওয়া না পর্যন্ত আফগান জনগণের সমস্ত শ্রেণীর মানুষ এই জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিল কারণ তারা একে দখলদারিত্ব হিসেবে মনে করেছিল এবং জিহাদকে বাধ্যতামূলক বলে গণ্য করেছিল যাতে কারো দ্বিমত ছিল না। রাশিয়ানদের প্রস্থানের পরের পর্যায় ছিল আরেকটি পর্যায়, কারণ অনেকে ভেবেছিল যেহেতু বিদেশী শক্তি চলে গেছে, তাই এখন আফগান কমিউনিস্টদের সাথে সমঝোতা করার সময় এসেছে। এই পর্যায়টি ছিল কাবুল বিজয়ের আগে। আমি এটিকে অন্যান্য পর্যায় থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করি। তারপর আসে সেই

পর্যায় যখন আমরা কাবুলে প্রবেশ করি। আমরা একে বলেছিলাম "ফাতহ কাবুল", যদিও আমরা যখন মন্ত্রি এবং শাসক হিসেবে প্রবেশ করলাম তখনও সেটি বিজিত হয়নি। এই পর্যায়টি স্থায়ী হয়েছিলো রব্বানী সরকারের পতন এবং তালিবানদের উত্থান পর্যন্ত। এরপর শুরু হয় তালিবানদের পর্যায় এবং তারপর আমেরিকার বিরুদ্ধে তালিবানদের জিহাদ, যে পর্যায়ে আজকে আমরা আছি। আমি জানি না যে আমাদের মোট কয়টি পর্যায় হয়েছে, আমরা যদি ভাগ করি... প্রতিটি পর্যায় তার নিজস্ব পক্ষ-বিপক্ষ, প্রয়োজন, সমস্যা, প্রকৃতি, বিধান আর অবস্থানের দিক থেকে ভিন্ন। সত্যিই আমি জীবনে ৩৪টি বছর পার করেছি জিহাদে এবং যদি আমি প্রথম দিককার বছরগুলোও যোগ করি, তাহলে আমার জীবনের মোট ৩৭ বছর হিজরত আর জিহাদে কেটেছে। এবং ১৯৭৫ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত, আমি মন্ত্রি হওয়া থেকে পদত্যাগ করা পর্যন্ত, এ সময় জিহাদের নেতৃত্বের স্থানে অতিবাহিত করেছি, সবচেয়ে উঁচু নেতৃত্ব অবস্থানে। তাই নিজেকে আফগান জিহাদের আর্কাইভ মনে করি। আমি যা শিখেছি তা লিখে ফেলা উচিত এবং বিতরণ করা উচিত যাতে মানুষ উপকৃত হতে পারে।

প্রশ্ন ২ঃ আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন আপনার কাজকে কবুল করেন। আমিন। একটি প্রশ্ন করতে চাই শাইখ। আমরা দেখেছি যে বেশ কয়েকজন জিহাদের নেতা যারা রাশিয়ানদের দখলের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন, তারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। যেমন, সাইইয়াফ এবং রব্বানীদের মতো নেতারা। তাদের ক্রুসেডার দখলদারিত্বের সহায়ক হিসেবে কাবুল সরকারকে সমর্থন করার মতো নীচ অবস্থানে নেমে যাওয়ার কারণ কি?

এর পিছনে একটি নয়, অনেক কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ জিহাদ এবং দাওয়াহ, যেমনটি আমি আগে বলেছিলাম, বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে সামনে এগোয়। কেউ একজন প্রথম স্তরে সফল হলেই সে যে পরবর্তী স্তরেও সফল হবে এমনটি হওয়া জরুরি নয়। কেননা প্রতিটি স্তরই তাদের প্রকৃতিতে আলাদা। এক সময়ে আল্লাহ একজন ব্যক্তিকে তার সাহসিকতার দ্বারা পরীক্ষা করতে পারেন এবং সে সেই পরীক্ষায় নিজেকে সাহসী প্রমাণ করতেও পারে। কিন্তু তিনি যখন ওই ব্যক্তিকে তার বিশ্বাসযোগ্যতার মাধ্যমে পরীক্ষা করেন তখন সে ব্যর্থ হতে পারে। কিংবা যখন তাকে নেতৃত্ব দিয়ে পরীক্ষা করা হবে তখন সে ন্যায়নিষ্ঠ শাসক নাও হতে পারে। এমনও হতে পারে যে যখন একজন ব্যক্তিকে তার বিশ্বাসযোগ্যতার দ্বারা পরীক্ষা করা হয় তখন সে নিজেকে বিশ্বস্ত প্রমাণ করতে পারে। কিন্তু তার হয়তো সেই গুনাবলী নেই যা দিয়ে সে তার কাছে অর্পিত বিষয়গুলো যথাযথভাবে পরিচালনা করতে পারবে। জিহাদের সবচেয়ে কঠিন স্তর হচ্ছে তখন যখন জিহাদি আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে আর ক্ষমতায় আরোহণ করে। আমার দাঁড়ি সাদা হয়ে গিয়েছিল যখন আমি কাবুলে একজন মন্ত্রী ছিলাম আর আমি একে স্তরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে তিক্ত আর কঠিন স্তর হিসেবে বিবেচনা করি। এবং এই কারণে আমি ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে পদত্যাগ করেছিলাম। তো সবচেয়ে কঠিন স্তর হচ্ছে যখন জিহাদি আন্দোলন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। অন্য সকল স্তর এই স্তরের তুলনায় সহজ। এই স্তরে একজন ব্যক্তিকে বিভিন্ন পরীক্ষায় পড়তে হয়, আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা, একজনের নিজস্ব কামনা বাসনা থেকে শুরু করে জিনদের মধ্যে হতে শয়তান কর্তৃক বয়ে আনা পরীক্ষা, সেই সাথে দুনিয়াবি জীবনের পরীক্ষা। একাধারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে একজনকে যুদ্ধ করতে হয়ঃ নিজের কামনার সাথে যুদ্ধ, রাজনৈতিক যুদ্ধ, জ্ঞানের যুদ্ধ, প্রশাসনিক যুদ্ধ, আরো অন্যান্য। এ সকল পরীক্ষার মুখোমুখি হয়ে অটল থাকা কঠিন। আমার মতে তাদের ভুল পথে পরিচালিত হওয়ার পিছনে সবচেয়ে বড় যে কারণটি কাজ করেছে তা হলো আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং একজন নেতার অনুপস্থিতি যার কথা সবাই শুনবে এবং মানবে। তাই আল্লাহ বলেছেন, **"তোমরা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়ো না, যদি তা করো তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে।"** [সুরা আল-আনফাল (৮)ঃ ৪৬] একটি দেশে যেখানে মুখ্য কর্তৃত্বাধীন কেউ নেই সেখানে অনেকগুলো রাজনৈতিক আন্দোলন একসাথে অবস্থান করতে পারে। কিন্তু অনেকগুলো সেনাবাহিনী কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছাড়া থাকতে পারে না। এটি নিশ্চিতভাবে সংঘাতের দিকে এগুবে। এই কারণে পৃথিবীর সকল জিহাদি আন্দোলনের উদ্দেশ্যে আমার উপদেশঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্র বিভিন্ন দলকে মেনে নেবে কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে এমনটি হবে না। হয় তাদেরকে একটি কেন্দ্রীয় সামরিক হুকুম অথবা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আওতায় একত্রিত হতে হবে অথবা নিঃসন্দেহে একটি গৃহযুদ্ধের সূচনা হবে। সবচেয়ে বড় গুনাহের মধ্যে হচ্ছে যে এক মুসলিম আরেক মুসলিমের রক্তপাত ঘটায়। তাহলে কিভাবে আল্লাহ তাদেরকে পথ দেখাবেন এবং সাহায্য করবেন? তিনি তাদেরকে তাদের স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে ছেড়ে দেবেন আর তারা হারিয়ে যাবে যেমনটি অন্যরা বাতিল হয়ে গিয়েছে।

প্রশ্ন ৩ঃ আমাদের শাইখ, এই সাক্ষাৎকারের পূর্বে আপনি ঈমান এবং ইসলামের বিকশিত হওয়া সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেছিলেন। এই প্রেক্ষিতে কিছু বলুন।

তালিবানদের পতনের সাথে সাথে যখন আমাদের নেতৃত্বের পতন হলো, আমি শুনলাম রব্বানী যে কিনা আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আক্বীদায় মাস্টার্স ডিগ্রী প্রাপ্ত প্রফেসর, আমেরিকানদের উৎসাহিত করছে মুজাহিদীনদের সজোরে আঘাত করার জন্য! একই সময় আমি আমির-উল-মুমিনীনকে শুনলাম, তিনি চ্যালেঞ্জ করে বলছেন, "তোমরা যা চাও তাই কর। আমরাও তোমাদের সাথে এই এই করবো!" তো আমি চিন্তা করলাম, "কেন? কেন এই পার্থক্য?" বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন জ্ঞানী অধ্যাপক এই সহজ পরীক্ষায় ব্যর্থ হল আর আরেকজন যে কিনা সংস্কার এবং জ্ঞানে তার পর্যায়ের নয় সে সফল হল। তো আমি একটা ব্যাপার অনুধাবন করলাম। আমাদের বর্তমান সংস্কৃতিতে, আমাদের শিক্ষার পাঠ্যক্রমে আমরা জ্ঞানের স্তরকে সবসময় বড় করে দেখি। তার কি আছে, মাস্টার্স? পিএইচডি? সে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক? সে কি অধ্যাপক? আমরা ঈমানের স্তরকে গুরুত্ব দেই না। ঈমান কোন স্তর পর্যন্ত বিকশিত হয়েছে তা মাপার জন্য কোনো পদ্ধতি নেই। একজন ব্যক্তির পিএইচডি থাকতে পারে, জ্ঞানের দিক থেকে সে হয়তো সেই স্তরের জীবন যাপন করতে পারে, কিন্তু ঈমানের দিক থেকে সে হয়তো মুনাফিকের স্তরই অতিক্রম করতে পারেনি। তাই আমি আরেকটি বিষয় উপলব্ধি করি। সালাফেরা, আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হন, শুধু জ্ঞানকে গুরুত্ব দিতেন না বরং তাঁরা শিক্ষাকে ঈমানের বিকাশের সাথে সম্পর্কিত করতেন এবং মানুষ সেভাবেই পরীক্ষিত হতো। একজন মানুষ কুরআন শুনত, হাদিস শুনত, এবং তারপর যে যুদ্ধে চলে যেত। বদরের যুদ্ধে সে অংশগ্রহণ করল, এবং তারপর তাঁদের ভুল-ভ্রান্তিগুলো সংশোধন করার জন্য আয়াত নাযিল হতো। তাই তাঁদের জ্ঞানের সাথে সাথে ঈমানের বিকাশ ঘটতে থাকে। আজকে আমাদের পাঠ্যক্রমগুলোতে আমরা শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে গুরুত্ব দেই। তারপর মাস্টার্স করা, পিএইচডি করা, তারপর প্রফেসর হওয়া। যখন একজন শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নেওয়া হয়, তাকে শুধু তার জ্ঞানের পরিধির উপর মূল্যায়ন করা হয়। এটি দেখা হয় না যে কিছু মেনে চলে কিনা, কিছু বিশ্বাস করে কিনা। দেখা হয়না যখন সে জিহাদের বই পড়ে তা সে পরীক্ষার ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত কিনা। সে হয়তো প্রস্তুত না। এমনকি সে জিহাদের ধারণাও প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এবং যিনি শিক্ষক তিনি নিজেও কি মানেন এবং সে অনুযায়ী চলেন? যদি তার শাইখ না মানেন, তাহলে তার ছাত্র কিভাবে মানবে? এবং আজকে দেখবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হওয়ার জন্য মানুষ ইহুদী খ্রিস্টানদের কাছ থেকে মাস্টার্স এবং পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করছেন। এই লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে সে কিছু জ্ঞান অর্জন করে আবার তা বইতেই ফেরত রেখে দিচ্ছে। এ যেন বই থেকে শুধু জ্ঞান বের করে নিয়ে আবার বইতেই তা ফেরত রেখে দেওয়া; সমাজে তার কোনো প্রভাব নেই। এজন্য আজকে আমরা ভুগছি। আজকে ইসলামি বিশ্বের সমস্যা হচ্ছে, আমাদের অনেক আলেম আছেন যারা নিজেরা চর্চা করেন না। সকল প্রশংসা আল্লাহর! এই কারণে সাহাবীদের ব্যাপারে বলা হয় যে, তাঁরা দশটি করে আয়াত মুখস্থ করতেন এবং তারপর এর মধ্যে থাকা যাবতীয় বিধান আর আল্লাহ যা আদেশ করেছেন, তার বাস্তবায়ন করতেন। এই বিষয়টি এসকল নেতাদের মধ্যে আজকে অনুপস্থিত। চর্চা না করলে এমনকি শিক্ষকও তার ছাত্রকে ইজাজাহ (পড়ানোর অনুমতি) দিতেন না। হ্যাঁ, হয়তো সে আমার সকল পাঠে উপস্থিত ছিলো, কিন্তু আমি তাকে আমার থেকে হাদিস বর্ণনা করার অনুমতি দেবো না। তাঁরা সে সমস্ত শিক্ষকের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করতেন না যারা নিজেরা অনুশীলন করতেন না। এবং শিক্ষকরাও সে সমস্ত ছাত্রদেরকে ইজাজাহ প্রদান করতেন না যারা নিজেরা চর্চা করতো না। এই কারণে, আজকে আমাদের একইসাথে শেখা আর চর্চা করার পাঠ্যক্রম ভেঙ্গে পড়েছে।

প্রশ্ন ৪ঃ শাইখ, রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে জিহাদের সময় থেকেই আপনার সাথে শাইখ উসামার (আল্লাহ তাকে রক্ষা করুন) খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আপনি কি আমাদের সেই সময় এবং সেই সম্পর্ক সম্বন্ধে বলবেন? সেই সম্পর্ক কিভাবে আরও সামনে এগুলো? আল-কায়েদা যে পথে অগ্রসর হচ্ছে তাকে আপনি সাধারণভাবে কিভাবে দেখছেন?

শাইখ উসামা (আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করুন এবং তাঁর উপর রহমত করুন) জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য আফগানিস্তানে আসার আগ থেকেই আমি তাঁকে চিনি। আমরা যখন সৌদি আরব ভ্রমণ করতাম, তিনি আমাদেরকে অতিথি হিসেবে আপ্যায়ন করাতেন। তিনি আমাদেরকে সম্মান করতেন এবং মুজাহিদীনদের সেবায় নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। এরপর তিনি তাঁর পরিবার এবং সন্তানদের নিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য চলে আসেন এবং জিহাদের যুদ্ধক্ষেত্রকেই নিজের বাসস্থানে পরিণত করেন। সেই সময়ে আমরা তাঁকে

মহান এক মুজাহিদ হিসেবে জানতাম। এ কারণে, ঠান্ডা এক শীতকালে তিনি যখন জাজির গুহাতে বসবাস করছিলেন, একজন লোক তাঁকে বললো, "যাও ও শাইখ! মক্কা আর মদিনার মসজিদ নির্মাণ করে এসো।" তাঁর কোম্পানিকেই চুক্তি প্রদান করা হয়েছিল। তিনি উত্তর দিলেন, "দুই পবিত্র মসজিদ নির্মাণ করার জন্যই আজকে আমি আফগানিস্তানে লড়াই করছি।" সেই সময়ে আমরা তাঁকে এক দারুণ ব্যক্তিত্ব হিসেবেও দেখতাম। তাঁর জনগণ আর তাঁর দেশও তাঁকে মুজাহিদ আর নায়ক হিসেবে জানতো। যখন তিনি সৌদি আরবে ফেরত যেতেন, লোকেরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতো। তিনি মসজিদে বক্তৃতা দিতেন। এবং তিনি আর তাঁর সাথীরা যারা তাঁর সাথে ফেরত আসতো তাঁদেরকে বিমান কোম্পানিগুলো টিকেটের দামে ছাড় দিতো। আরব মিডিয়া আর রাজনীতি সম্পর্কে এই হচ্ছে তাই যা আমাকে আশ্চর্য করে। কেন এরকম হলো যে যখন এই লোক রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলো, তাঁকে একজন মুজাহিদ, একজন নায়ক আর ধার্মিক হিসেবে বিবেচনা করা হলো, যাকে সমস্ত লোকেরা সাহায্য করতো, প্রশংসা করতো। যখন তিনি ইয়েমেনের এডেনে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন, তখনো তিনি একজন মুজাহিদ নায়ক হিসেবে সবার সন্তুষ্টি আর প্রশংসা লাভ করলেন। কিন্তু যখন যুদ্ধ রাশিয়ানদের থেকে আমেরিকানদের দিকে ঝুঁকে গেলো, তখন তিনি সন্ত্রাসী, বিপজ্জনক ব্যক্তি আর খাওয়ারেজ হয়ে গেলেন! হঠাৎ করে সবকিছুর মাপকাঠি কিভাবে বদলে গেলো? যখন তিনি রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন, তাঁর সাথে কখনোই কোনো সরকার বা লোকদের সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। পাকিস্তানি সরকারের সাথে তাঁর কোনো সমস্যা হয়নি, বরং তারাই তাঁর জন্য আর তাঁর সহযোদ্ধাদের জন্য ভিসা ইস্যু করে দিতো। তাঁর বাড়ি ছিলো পেশাওয়ারে, সবাই সেখানে যেতো। তিনি বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিতেন, যেমনঃ মসজিদ নির্মাণ, এতিমখানা তৈরি। পাকিস্তানি সরকার আর গোয়েন্দাবাহিনী তাঁর ব্যাপারে জানতো। আরব সরকার বা পাকিস্তানকে রাগান্বিত করার মতো কিছুই ছিলো না। সমস্ত সমস্যা তখনই শুরু হলো যখন যুদ্ধ আমেরিকার বিরুদ্ধে ঘুরে গেলো। তাদের প্রভু আমেরিকা তাদেরকে নির্দেশ দিলো উসামাকে দোষী সাব্যস্ত করতে, তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করতে আর তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে। আর এভাবেই পূর্বের সমস্ত মানদন্ড নড়ে গেলো। যখন থেকে তিনি আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা শুরু করলেন, তখন থেকেই তাঁকে নিয়ে সমস্যা শুরু হলো। যখন আমেরিকা নিজে উসামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করলো, তখন অনেকে তাঁর সমালোচনা করতে লাগলো এই বলে যে তিনিই সমস্যা তৈরি করেছেন ইত্যাদি...কিন্তু তারা লক্ষ্য করলো না যে কে তা শুরু করেছে। তারা আমাদেরকে আক্রমণ করেছে_ আপনি কিভাবে এটা কল্পনা করেন যে একজন ব্যক্তি আপনাকে আঘাত করে আর আপনি তাকে ফিরতি আঘাত করবেন না! একজন ব্যক্তি আপনাকে হত্যা করার চেষ্টা চালায় আর আপনি উত্তরে "আসসালামু আলাইক" বলেন? এটা অযৌক্তিক। এই মানুষটি (শাইখ উসামা) নিজেকে, তাঁর বিশ্বাসকে, তাঁর দলকে রক্ষা করেছেন এবং তা ছিল তাঁর অধিকার। তাছাড়া, তিনি একজন ব্যক্তি যিনি জিহাদের পথকে বেঁছে নিয়েছেন। তিনি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন যারা আফগানিস্তানের মাটিতে আগ্রাসন চালিয়েছে। তিনি দখলদার আগ্রাসনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ডাক দিয়েছেন, যখন আগ্রাসনকারীর দল ছিল কমিউনিস্ট এবং যখন আগ্রাসনকারীরা আমেরিকান আর ন্যাটো বাহিনীর চেহারায় আসলো, তখনও তিনি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, আত্মরক্ষামূলক জিহাদ করেছেন। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা আমাদের ভূমির স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছি, তখন কমিউনিস্টদের আমলে এবং এখন ন্যাটোর আমলে। আমরা যখন ওয়ারশ চুক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, ন্যাটো আমাদের সমর্থনে পাশে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আমরা না ন্যাটোর স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ওয়ারশ চুক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছিলাম না তাদের সাথে আমাদের কোন সৌজন্যমূলক বা আনুষ্ঠানিক চুক্তি ছিল। তারা কি ভেবেছে আমরা ১.৬ মিলিয়ন শহীদকে উৎসর্গ করেছি ইউরোপ আর আমেরিকার উপকার করার জন্য? এটা কি এতো সহজ যে আমরা এই রক্ত তাদের স্বার্থের জন্য ছেড়ে দেব? হ্যাঁ, তারা ডলারের বিনিময়ে কিছু চরকে কিনে নিতে পেরেছিল, যারা কিনা আমেরিকাকে এই উপাধি উপহার দিয়েছে যে এটা ছিল "আমেরিকার জিহাদ"। কিন্তু আফগানি মানুষ জানে যে এই রক্ত ঝরেছে ইসলামের জন্য, ইসলামি সরকার আর খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং আমরা আমাদের এই কষ্টলব্ধ অর্জনকে ফেলে দেবো না। তাই উসামা সেই একই পদ্ধতিতে জিহাদ করছে যাকে সবাই সমর্থন করতো। যখন আমরা রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলাম, পৃথিবীর একশোটিরও বেশি রাষ্ট্র জাতিসংঘে মিলিত হয়ে আমাদের জিহাদের পক্ষে রায় দিয়েছিল। তারা আমাদেরকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বিবেচনা করেছে আর রাশিয়ানদের দেখেছে আগ্রাসনকারী হিসেবে। কিন্তু যতক্ষণ আগ্রাসী শক্তি হচ্ছে সবচেয়ে বড় মূর্তিপূজক সরকার, এ যুগের ফিরআউন - আমেরিকা, তখন কেউ একটা পদক্ষেপ নিতে সমর্থ হলো না। আল্লাহ তাদেরকে আর তাদের কার্যক্রমকে প্রকাশিত করে দিয়েছেন।

শাইখ আমরা এখন অন্য প্রসঙ্গে আরেকটি প্রশ্নে যাবো। আমেরিকার বিরুদ্ধে আক্রমণ দুটির (ওয়াশিংটন এবং নিউ ইয়র্ক) পূর্বে আপনি কেন ইসলামিক আমিরাতে যোগ দিলেন এবং আক্রমণের পর তার সাথে রইলেন?

রব্বানী সরকারের আমলে যখন জামাত-ই-ইসলামী আর হিযব-ই-ইসলামী দল দুটি নিজেদের মধ্যে অন্তর্বিরোধে জড়িয়ে পড়েছিল, আমি তখন মন্ত্রণালয়ের কাছে আমার পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেই। আমি রাজনীতির মাঠ থেকে চলে আসি আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে থাকি। যখন তালিবান আন্দোলন শুরু হলো, আমি তাদের প্রতি আমার সমর্থন ঘোষণা করি। আমি তাদেরকে দেখেছিলাম একটি সংস্কারমূলক আন্দোলন হিসেবে যা সাধারণ জনগণের মধ্য থেকে উঠে এসেছে। যখন তারা বিজয় অর্জন করলো আর ইমারাত প্রতিষ্ঠা করলো, আমি ভেবেছিলাম যে কোন সরকারি পদে দায়িত্ব পালন করার চেয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে থাকাটাই আমার জন্য ভালো হবে। যখন ১১ সেপ্টেম্বরের শিক্ষা দেওয়া হলো আর আমেরিকা আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ ঘোষণা করলো, তখন আমি দেখলাম যে জিহাদ আমার জন্য ব্যক্তিগত বাধ্যকতা (ফারদুল 'আইন)-এ পরিণত হয়েছে। যেখানে জিহাদ হচ্ছে, সেখানে আমার জন্য স্কুলে শিক্ষকতা করার আর কোন পথ খোলা রইল না। এই কারণে, আমি তালিবানদের কাতারে যোগ দিলাম আর তাদেরকে বললাম, "এখন আমি আমির-উল-মুমিনীন এর কর্তৃত্বের অধীনে তোমাদের কাতারে চলে এসেছি।" তিনিই ছিলেন জিহাদের একমাত্র নেতা। একমাত্র তিনিই এই অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, বাকি সবাই আমেরিকাকে সমর্থন করেছিল। আমার আর কোন উপায় ছিলো না। তাঁর পথ ছিল সুস্পষ্ট ... তাঁর পথ ছিল সুস্পষ্ট, আর তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ যে আমেরিকার সাথে কোন রকম সমঝোতা করার প্রস্তাব দেননি। ইসলামের জন্য তাঁর যে নিরাপত্তামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, তার কারণে তিনি সব কিছু উৎসর্গ করেছেন আর সকল পরিণাম মেনে নিয়েছেন।

একই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করছি, আমেরিকার বিরুদ্ধে দুটি হামলার পরে আমির-উল-মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর (আল্লাহ তাকে সুরক্ষিত রাখুন) এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে তার অবস্থান সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন?

বাস্তবিকভাবে, কিছু লোক মনে করে যে মোল্লা মুহাম্মাদ উমর ভুল করেছেন যে, তিনি শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিকে রক্ষা করতে গিয়ে ক্ষমতা ত্যাগ করেছেন আর তাঁর সম্পর্কে যে সমস্ত সন্দেহগুলো বলে বেড়ানো হয় তার একটি এরকম যে তিনি রাজনীতিতে অভিজ্ঞ নন। মুহাম্মাদ উমরের ঘনিষ্ঠ একজন ব্যক্তি, যিনি শুরা কমিটির সদস্য, তার কাছ থেকে আমি যেরকম শুনেছি তা অনুযায়ী আমেরিকা শুধুমাত্র উসামাকেই তার কাছে হস্তান্তর করার দাবি করেনি। বরং আমেরিকা তার কাছ থেকে যা দাবি করেছিলো তা ছিল ৩০টির মতো একটি তালিকা। এসব দাবির মধ্যে ছিল ইসলামি আইনের প্রত্যাহার, শিক্ষা পাঠ্যসূচির পরিবর্তন, সহশিক্ষা প্রবর্তন, সরকারে ধর্মনিরপেক্ষদের অন্তর্ভুক্তকরণ, হুদুদের প্রত্যাহার এবং সকল অ-আফগানি মুজাহিদীনদের আমেরিকার কাছে হস্তান্তর। এর অর্থ দাঁড়ায়, সবমিলে তারা আরেকটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। আমির-উল-মুমিনীনের জন্য এসব শর্ত মেনে নেওয়া অসম্ভব ছিল। এ ছিল যেন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার বিনিময়ে কুফরকে মেনে নেওয়ার মতো ব্যাপার। সে কঠিন সময়ে দৃঢ় থাকার জন্য এবং তার ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাঁকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। আমেরিকার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জিহাদের ঘোষণা দেওয়া মানুষের জন্য খুবই কঠিন কাজ ছিল। তিনি যে পদক্ষেপ নিয়েছেন তাকে আমি ঐতিহাসিক বলে মনে করি এবং তাঁকে এমন একজন মানুষ হিসেবে দেখি যিনি সত্যিকার অর্থে আফগান জনগণ এবং মুজাহিদীনদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আফগানিস্তানে ইসলামের জন্য যে রক্ত ঝরেছে তার সুরক্ষা তিনি করেছেন। আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন তাঁকে সুরক্ষিত রাখেন, নিরাপদে রাখেন আর সত্যের উপর তাঁকে অবিচল রাখেন। এখানে এটা উল্লেখ না করলেই নয় যে আমি এখনও তাঁকে সামনা সামনি দেখিনি বা তাঁর সাথে বসবাস করিনি কারণ আমি ছিলাম পুরনো জিহাদি আন্দোলনের মধ্যে যেখানে তিনি ছিলেন নতুন প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনের মধ্যে। তিনি আমার সাথে কখনও সাক্ষাৎ করেননি, তিনি আমাকে চেনেনও না। হয়তো তিনি মিডিয়ার মাধ্যমে অথবা আমার কণ্ঠের মাধ্যমে আমার কথা শুনে থাকবেন। আমি নিজেকে তাঁর নেতৃত্বের অধীনে তাঁর একজন সৈনিক হিসেবে ঘোষণা করেছি শুধুমাত্র এই কারণে যে তিনি সত্যের পক্ষে আর বাতিলের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। আর আমি তাঁর থেকে আরও উত্তম কাজের অপেক্ষায় আছি। আমরা তাঁর সুরক্ষার জন্য মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করছি।

প্রশ্ন ৫ঃ অনেকেই যারা নিজেদেরকে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত আর আলিম হিসেবে দাবি করেন, তারা যে ইসলামি বিশ্বে সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে আফগানিস্তানে পুতুল সরকারগুলোকে সমর্থন করে যাচ্ছে, এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? রাশিয়ার দখলদারিত্বের সময় তারা যে অবস্থান নিয়েছিল এখন আমেরিকার দখলদারিত্বের সময় তাদের সেই অবস্থান পরিবর্তন করার কারণ

কি? এই দুই অবস্থানের মধ্যে পরিস্কার পার্থক্য আছে। রাশিয়ার দখলদারিত্বের সময় তারা জিহাদকে সমর্থন করেছে কিন্তু যখন আমেরিকা আসলো, যেমনটি আপনি বলেছেন, কিছু একটা যেন ভুল হচ্ছে। এসমস্ত অবস্থান সম্পর্কে আপনি কি চিন্তা করছেন?

অবশ্যই আমি এসমস্ত অবস্থান প্রত্যাখ্যান করছি। প্রশ্নটি কি ছিলো? তারা কেন এসমস্ত অবস্থান নিয়েছে? নাকি আমরা তাদের সম্পর্কে কি ভাবছি?

যারা নিজেদেরকে ইসলামের প্রচারক এবং ইসলামে জ্ঞানী বলে দাবি করে তাদের এসমস্ত অবস্থান সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

আল্লাহর কসম! আমি মনে করি এ এক মহা দুর্যোগ যা ইসলামি দুনিয়ার উপর আপতিত হয়েছে। হ্যাঁ, এটি একটি বিপর্যয় যে ক্রুসেডাররা তাদের সমস্ত শক্তি একত্রিত করেছে এবং ইসলামি দুনিয়াকে আক্রমণ করেছে। কিন্তু বাস্তবতা এরকম যে এই উম্মাহর আলিমরা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ফতোয়া দেওয়ার উপর ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেননি এটা আরও ভয়াবহ বিপর্যয়! এটাই সবচেয়ে মারাত্মক দুর্যোগ। এটা একটা সহজবোধ্য বাস্তবতা যে শত্রুরা ইসলামি ভূমি দখল করতে চায়, তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায়। কিন্তু সবচেয়ে বড় দুর্যোগ এটাই যে এই উম্মাহর মধ্যে এমন একজনও সাহসী ব্যক্তি নেই যিনি জিহাদের ডাক দেবেন অথবা তাদের বিরুদ্ধে সত্যিকারের অবস্থান গ্রহণ করবেন। আসলেই, আমার মতে, এই পর্যায়ে আমাকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয় যে ব্যাপারটি তা হলো আলিমদের অনেকেই কুফরের পক্ষাবলম্বন করছেন এবং অনেক মিথ্যা ফতোয়া জারি করেছেন, যার পরিণামে তারা যুবসমাজের আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। এর ফলে যুবসমাজ আর আলিমসমাজের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। আর আমি এটাকে খুবই বিপজ্জনক বলে মনে করি। তো এই হলো তাদের অবস্থা। রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে জিহাদে তারা পাশে ছিল কারণ সেটা ছিল একটা সহজ জিহাদ। রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে জিহাদে তাদের সমর্থনের মূল্য হিসেবে তাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়নি। শাসকশ্রেণী, সাধারণ জনগণ, মিডিয়া এবং আমেরিকা সবই সমর্থনে ছিল এবং অবশ্যই যখন তারা এই জিহাদকে সমর্থন করেছেন, তখন তারা সে জন্য খ্যাতিও অর্জন করেছিলেন। আর আজকে আমেরিকা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, কারাগারে পাঠাবে, সন্ত্রাসীর তালিকায় তাদের নাম যুক্ত করবে। আর আমেরিকার পা চাটা সরকারগুলো তাদেরকে জেলবন্দী করবে, নির্যাতন করবে। এবং সাধারণ জনগণ, পরিবার, স্ত্রী, এবং অন্যান্যদেরকে ... জেলে আমি যে কষ্টে ভুগেছি, দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়েছি তার একমাত্র কারণ ছিল এই যে আমি ঘোষণা করেছি যে আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ একটি বাধ্যতামূলক দায়িত্ব। আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়ে ফিরে আসি। ইসলামি বিশ্বের সেই রকম আলিমদের ভীষণ প্রয়োজন যারা যা প্রচার করে তা তাঁরা বাস্তবেও করে দেখায় আর জিহাদ করে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য, তালিবান আন্দোলন যেহেতু জিহাদে সম্পৃক্ত আছে, সেকারণে এর অস্ত্র আলিমগণ নিজেরাই বহন করছেন। ভবিষ্যতে আল্লাহর ইচ্ছায় আফগানিস্তানে আমরা এই সমস্যার মুখোমুখি হবো না, কেননা আলিমগণ নিজেরাই হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছেন।

আলিমদের প্রতি এবং ইসলাম প্রচারকদের প্রতি আপনার উপদেশ কি?

আল্লাহর কসম! সম্মান এবং সত্যনিষ্ঠ জীবনকে আমি নেতৃত্বের পদে থেকে অপমানের জীবনের চেয়ে অনেক উত্তম বলে গণ্য করি। এই পৃথিবীর কোন মূল্যই নেই। এটা কেবলমাত্র একটা ক্ষণস্থায়ী আনন্দের জায়গা। কে আছে যে এর বিনিময়ে চিরস্থায়ী ক্ষতিকে কিনে নেবে? আলিমগণ যদি সত্য কথা বলতেন, তাহলে তাদের কি ক্ষতি হবে? জেল? আমি এর মধ্যে বন্দী ছিলাম এবং নিরাপদে বেরিয়ে এসেছি। আল্লাহর কসম! আমি কারাগারে যা দেখেছি এবং যা শিখেছি তা আমি যা হারিয়েছি তার তুলনায় অনেক বেশি মূল্যবান। যদি না এটা একটা দুর্যোগ হতো, তাহলে আমি দু'আ করতাম যে, সকল আলেমই যেন এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যান। আমি তাদেরকে উপদেশ দেই যে নিন্দার ভয় করবেন না। আলিমগণ যদি সঠিক অবস্থান না নেন এবং সত্য ফতোয়া না দেন, তাহলে ইসলামি উম্মাহর মধ্যে তাদের সুফল বা ভূমিকা কি? কিছু সংখ্যক আলিম আমার নিকট এসেছিলেন এবং জেলে আমার সাথে বিতর্ক করেছিলেন। আমাকে তারা ক্লান্ত করে দিলেন, এই বলে যে, "সমঝোতা করুন। আপনার উপর জবরদস্তি করা হচ্ছে এবং এরকম হলে আপনাকে তা নেওয়ার জন্য দ্বীনে উল্লেখ আছে।" আমি তাদেরকে বললাম, "হ্যাঁ। কিন্তু আলিমগণ যদি সমঝোতা করা শুরু করে তাহলে এর পরিণামে দ্বীনই পরিবর্তিত হয়ে যাবে।" উদাহরণস্বরূপ ইমাম আহমেদ এবং ইমাম আবু হানিফার (আল্লাহ তাঁদের উপর রহমত করুন) কথা ধরুন। হাম্বলী মতে যদিও সমঝোতা করাকে স্বাভাবিক কার্যধারার তুলনায় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে,

ইমাম নিজে কুরআন সৃষ্টির ব্যাপারে মুতাজিলাদের সাথে অনুমতি নেননি। তিনি বলেছিলেন, "যদি অজ্ঞ লোকেরা না জানে এবং আলিমগণ যদি তাঁদের কথার পিছনেই লুকিয়ে যান, তাহলে সত্য কথা কে বলবে?" আজকে ঠিক একই অবস্থা হয়েছে। আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ করার সিদ্ধান্ত কে দিচ্ছে? বরং, আলিমগণ রায় দিচ্ছেন যে তাদের সাহায্য কামনা করার অনুমোদন আছে, তাদেরকে মেনে নেওয়া যাবে এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া যাবে! তো আজকে আমাদের এই অবস্থা। ইমাম আবু হানিফার সাথেও একই ঘটনা ঘটেছিল। বিচারকের পদ প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাঁকে বন্দিত্ব আর নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। শাসকেরা তাঁর কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করতো? তারা চাইতো যে তিনি একজন বিচারক হন! আমি ভাইদেরকে উপদেশ দেই, আমার ভাই এবং আমার শিক্ষক যারা আমার জ্যেষ্ঠ এবং আমার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানী, আমি তাদেরকে উপদেশ দেই যে সত্য এবং জ্ঞান তাদের থেকে যা প্রয়োজন অনুভব করে তারা যেন তাই হন এই যে দ্বীনের ব্যাপারে তাঁরা নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় না করেন। এই পৃথিবীর জীবনের চেয়ে শুহাদা অনেক উত্তম, আর মৃত্যু তাঁদের কাছে একদিন অবশ্যই আসবে, হয় তাঁরা বাতিলের দ্বারা মৃত্যুবরণ করবেন এবং শুহাদা অর্জন করবেন নয়তো মৃত্যুর ফেরেশতারা তাঁদেরকে নিয়ে যাবেন। ফলাফল সেই একই। কিন্তু এভাবে তাঁরা কখনই শুহাদা অর্জন করতে পারবেন না। আলিমদের লজ্জাজনক পক্ষপাতিত্বের কারণে দেখুন কি ধরণের অপমান তাঁদের উপর এসেছে। এমনকি আমেরিকানরাও তাঁদেরকে নিয়ে উপহাস করে, হাসাহাসি করে। আমি ওই সমস্ত আলিমদেরকে বলছি, এই মুহূর্তে যুবসমাজের সম্পূর্ণ একটা প্রজন্ম নিজেদেরকে শুহাদা অপারেশনের মাধ্যমে উৎসর্গ করতে মুখিয়ে আছে। যদি একজন যুবক মুজাহিদ যার কাছে খুব বেশি জ্ঞান নেই, নিজেকে উৎসর্গ করতে আর দ্বীনের খাতিরে নিজেকে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে আলিমরা কেন সত্য কথা বলার জন্য শুহাদা গ্রহণ করতে এবং তা দ্বারা শহীদদের নেতা হওয়ার মর্যাদা অর্জন করতে পিছপা হবেন? আমি পরামর্শ দেই যে আলিম এবং ইসলাম প্রচারকদের একটি দল থাকুক যারা ইসলাম প্রচার ও মিডিয়ার ক্ষেত্রে সত্য কথা বলে শুহাদা অপারেশন পরিচালনা করবে। তাঁদেরকে এর মূল্য দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমি নিজে, এই অবস্থান নিয়ে মৃত্যু, গুপ্তহত্যা আর দ্বিতীয়বারের মতো বন্দিত্বের মুখোমুখি হয়েছি। এবং আমি এটা মেনে নিয়েছি আর একে আমি শুহাদা অর্জনেরই একটা সুযোগ বলে মনে করি। অপমানের জীবনের চেয়ে শুহাদা অনেক বেশি উত্তম।

প্রশ্ন ৬ঃ আল্লাহ আপনাকে সুরক্ষিত রাখুন। আমাদের শাইখ, আমরা কি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি যে আজকে আফগানিস্তানে এবং বাকি সমস্ত মুসলিম দুনিয়াতে জিহাদের বিধান কি?

শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত জিহাদ একটি স্থায়ী ফরজ দায়িত্ব। শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত করুন) যখন তাঁর **"মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত ফরজ দায়িত্বগুলোর মধ্যে একটি"** নামের বইটি লিখছিলেন, আমি তখন তাঁর সাথেই ছিলাম। বইটি তিনি এই উম্মাহর আলেমদের কর্তৃক স্বাক্ষর নিয়ে সত্যায়িত করেছিলেন। স্বাক্ষর দেওয়ার পূর্বে বইটি যখন শাইখ ইবন বাজ এবং অন্যান্য আলেমদের সামনে তুলে ধরা হয়, সেই উপস্থাপনায় আমি হাজির ছিলাম। "আফগানিস্তানে জিহাদ করা সমস্ত মুসলিমের উপরে ব্যক্তিগত পর্যায়ের ফরজ" - এই ফতোয়াটির ব্যাপারে সবাই একমত ছিলেন এবং আফগানিস্তানের জিহাদে এই ফতোয়ার বাস্তবায়নে কেউই দ্বিমত পোষণ করেননি। শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত করুন) এই ফতোয়াটি গ্রহণ করেছিলেন এবং যারা ফতোয়া প্রদানে ও বিধানের উৎস সম্পর্কে যোগ্য তাঁদের অধিকাংশের স্বাক্ষর নিয়ে তিনি ফতোয়াটির সত্যায়ন করেছিলেন। তারপর তিনি এটিকে একটি বই আকারে সংকলন করেছিলেন। আপনাদের পরিচিত বইগুলোতে এই ফতোয়াটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই ফতোয়াটির ব্যাপারে মতামতের কোন পার্থক্য নেই। ফিকহের আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে যদি কোনো ইসলামি ভূমি আক্রান্ত হয় তাহলে জিহাদ করা প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায়। যদি প্রাচ্যের কোন ইসলামি ভূমি আক্রান্ত হয়, তাহলে পাশ্চাত্যের মুসলিমদের উপর জিহাদ করা বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায় এবং অনুরূপভাবে যদি পাশ্চাত্যের কোনো ইসলামি ভূমি আক্রান্ত হয়, তাহলে প্রাচ্যের মুসলিমদের উপর জিহাদ করা বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায়। এই ফতোয়ার ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই, একমাত্র এর বাস্তবায়নেই আমাদের সমস্যা। জিহাদের ফতোয়া এখনও কার্যকর, একমাত্র এর বাস্তবায়নেই আমাদের যত সমস্যা। আমাদের জিহাদকে যেসব আলিম জিহাদ বলে গণ্য করেন না, তাঁরা এই ফতোয়াকে আমাদের এখনকার যুদ্ধের উপর প্রাসঙ্গিক মনে করেন না। তাঁরা এই আগ্রাসনকে আগ্রাসন হিসেবে ধরছেন না। আমি এই বিষয়ে বিতর্ক করতে চাই এবং তাঁদেরকে প্রকাশ্যে জিজ্ঞেস করতে চাই। ওই সব বিখ্যাত আলিমগণ এর উত্তর দিক। রাশিয়ার কুফরি এবং আমেরিকার কুফরির মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? অবশ্যই এটা কুফরি কিনা আমি সেটা বিবেচনা করে বলছি। হ্যাঁ, যদিও তাদের

কুফরির ধরণে পার্থক্য আছে। একটি হচ্ছে কমিউনিজমের কুফরি যেখানে আরেকটি হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতার কুফরি। কিন্তু তারা উভয়েই যে কাফির সেই সত্যে কোন পার্থক্য নেই। তারা উভয়েই কাফির সেনাবাহিনী। দ্বিতীয় প্রশ্নঃ আগ্রাসনের বিষয়ে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি? আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আগ্রাসন (ওয়ারশ চুক্তি) কি ইরাক ও আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আমেরিকার জোটবাহিনীর বা ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে ইহুদীদের আগ্রাসন থেকে ভিন্ন? এগুলো সবই যে আগ্রাসী কর্মকান্ড, তাতে কোন পার্থক্য নেই। এগুলো সবই মুসলিমদের ভূমি, সম্মান, দ্বীন, আর বাকি সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে আগ্রাসী কর্মকান্ড। তো যদি তারা উভয়েই কুফরি শক্তি হয়ে থাকে এবং তাদের উভয়েই আগ্রাসী কর্মকান্ড চালিয়ে থাকে, তাহলে তাদের উপর প্রযোজ্য ফতোয়া ভিন্ন হবে কেন? এটা হচ্ছে প্রশ্ন। কিভাবে? তাদের কেউ কেউ কখনও এটা বলে যে, ইরাকে জিহাদ করাটা বাধ্যতামূলক ... একজন আফগান আলিম আমার নিকট আসলেন এবং বললেন, "আফগানিস্তানে আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ করাটা বাধ্যতামূলক নয়।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেন?" তিনি বললেন, "কারণ তারা এসেছে জাতিসংঘের নেওয়া একটি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে।" আমি বললাম, "তাহলে ইরাক যুদ্ধের ব্যাপারে কি হবে?" তিনি বললেন, "ইরাকের যুদ্ধ জিহাদ হিসেবে গণ্য হবে।" আমি বললাম, "আপনাদের পূর্ববর্তী জিহাদের সময়, আফগানিস্তানের কারণে আপনারা ইরাকের জনগণের উপর জিহাদ করাটা বাধ্যতামূলক মনে করেছিলেন, এবং আজকে আমরা ইরাকের কারণে আফগানিস্তানের জনগণের উপর জিহাদ করাটা বাধ্যতামূলক মনে করি ... বিষয়টি এমনই সহজবোধ্য।" তিনি নিশ্চুপ রইলেন, এর কোন উত্তর দিতে পারলেন না। জিহাদ যদি ইরাকে ব্যক্তিগত পর্যায়ের বাধ্যবাধকতা হয়, তাহলে আফগানিস্তানে তা কিভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ের বাধ্যবাধকতা হয় না?! যেখানে শত্রুপক্ষ একই! এখানে ইরাকে এই আমেরিকার কাফিররা যদি যুদ্ধরত বাহিনী (হারবি) হিসেবে গণ্য হয়, তাহলে কে তাদেরকে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত (মুস্তামান) বানিয়েদিল অথবা আফগানিস্তানে বা পাকিস্তানে আমাদের সাথে চুক্তিতে (মুআহাদ) আবদ্ধ করে দিল? যদি এই বিচারকরা বা আলিমগণ ফিলিস্তিন এবং ইরাকে তাদেরকে যুদ্ধরত বাহিনী হিসেবে বলে দেন, তাহলে কিভাবে তারা আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং অন্যান্য ইসলামি ভূমিতে তাদেরকে যুদ্ধরত বাহিনী বলতে পারছেন না? কি কারণে তারা পার্থক্য করছেন? এই সকল সীমান্তরেখা কি ইসলামে কোন রকম বিবেচনা পাওয়ার যোগ্য? আর কে সেই খলিফা যে তাদেরকে এই নিরাপত্তা প্রদান করলেন? তাই এই বিষয়টি আইন থেকে আসেনি, এসেছে কুপ্রবৃত্তি থেকে। এটি এমন কোন বিষয় নয় যেখানে আলিমগণ মতপার্থক্য করেছেন না এটি জ্ঞানের অভাবের কারণে হয়েছে। যে সকল বিষয়ে আলিমগণ ভিন্নমত পোষণ করেছেন তা তাঁদের জ্ঞানের অভাবের কারণে নয়। বরং এটা শত্রুর বিপক্ষে তাঁদের সাহসিকতার অভাবের কারণে হয়েছে। তাঁদের সদিচ্ছা আর আত্মোৎসর্গ করার গ্রহণযোগ্যতার অভাবে হয়েছে। এই কারণে, এটা যতটা না জ্ঞান সম্পর্কিত সমস্যা, তার চেয়ে বেশি মানসিকতার সমস্যা। তাঁদের একজন আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কেন এই সকল বিষয়ের উপর ফতোয়া দেন?" আমি বলেছি, "আমি মুফতি নই, আমি জ্ঞানের ছাত্র। আমি কেবলমাত্র ফতোয়া বর্ণনা করি আর বিধানের ব্যাখ্যা দেই। বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করা আর বিধান ও ফতোয়া বর্ণনা করাকে ফতোয়া দেওয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয় না।" এই সকল বিষয় যারা মতপার্থক্য করে... আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করিঃ আজকের পৃথিবীতে কারা হচ্ছে যুদ্ধবাজ (হারবি) কাফির গোষ্ঠী? কাফিরদের মধ্যে যদি আজকে ইহুদীরা আমাদের প্রিয়জন হয়, তারা এক শান্তিপ্রিয় দল হয় এবং তাদের সাথে আমাদের চুক্তি (মুআহাদ) থাকে এবং খ্রিস্টানরা আমাদের প্রিয়জন হয় যারা আমাদেরকে সাহায্য করে, তাহলে আমাদের সময়ে যুদ্ধরত অবিশ্বাসীরা কারা? কাদেরকে হত্যা করা উচিৎ? কাউকে না? তাহলে অবশ্যই জাপান, কোরিয়া, এবং চীন হারবি না হওয়ার জন্য বেশি যোগ্যতা রাখে। যদি ইহুদী আর খ্রিস্টানরা হারবি না হয়, তাহলে এটাই যৌক্তিক যে তাদেরকে বর্তমান কাফিরদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হোক। তো আজকের পৃথিবীতে কেউ হারবি কাফির নয়? আজকের পৃথিবীতে কেউ নেই যে আমাদের শত্রু? তো আমরা যে আয়াতগুলো পড়ি "তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর...তাদেরকে হত্যা করো... তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর...তারপর তাদেরকে হত্যা করো..." সেগুলো সব বাতিল হয়ে গেছে? তাই আজকে এটাই বাধ্যতামূলক যে তালিবান আর আল-কায়েদার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে? এই আয়াতগুলো আমাদের বিপক্ষেই খাটে আর শত্রুরা আমাদের প্রিয়জন বনে যায়? আমি তাদের একজনের কাছে এই পরামর্শ দিয়েছিলাম যে...আমি তাদেরকে আরও সহজ কিছু অনুরোধ করেছিলাম। আমি এইসব আলিমদেরকে একটি পরামর্শ দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে এর চেয়ে সহজ একটি অনুরোধ করেছিলাম। আমেরিকা হারবি কাফির কিনা, তাদেরকে নিরাপত্তা (মুস্তামান) প্রদান করা হয়েছে কিনা অথবা তারা এমন এক দল যাদের সাথে আমাদের একটি চুক্তি (মুআহাদ) আছে কিনা, সেই বিষয়ে মতভেদ না করে, আমি তাদেরকে আরেকটি প্রশ্ন করলাম। তারা এমন একটি ফতোয়া দিক যে আমেরিকানরা কাফির। আর কাফিররা হচ্ছে আমাদের শত্রু যারা আমাদের থেকে ঘৃণা, আক্রোশ আর শত্রুতা পাওয়ার যোগ্য। তো আমেরিকানরা কি কাফির নাকি না? যদি তারা বলে, "হ্যাঁ, তারা কাফির।" তাহলে কাফিরদের ঘৃণা করা বাধ্যতামূলক কি না? তাদের

আর আমাদের মধ্যে শত্রুতা আর ঘৃণা থাকা উচিত কিনা? নাকি শত্রুতা শুধুমাত্র মুসলিমদের বিরুদ্ধে যারা শাসকদের রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করেছে? তারা এই ঘোষণা দিক যে ইহুদী আর খ্রিস্টানরা আমাদের শত্রু। আর এই যে তারা আমাদের থেকে ঘৃণা আর আক্রোশ পাওয়ার যোগ্য। এটা এমন কিছু যা তারা বাতিল করতে পারবে না। তারা কি কাফিরদের কুফর ঘোষণা করতে সমর্থ? আমি আরও সহজ কিছু অনুরোধ করছি। তাদের বর্তমান শাসকশ্রেণী, তারা আরব অনারব যাই হোক, তাদের কুফরি ঘোষণা করতে হবে না। তারা কাফির আমেরিকানদের কুফরি ঘোষণা করুক, কাফিরদের কুফরি ঘোষণা করুক! তারা বলুক যে ইহুদী আর খ্রিস্টানরা কাফির এবং তারা আমাদের শত্রু! নিঃসন্দেহে তারা এমন নিচের স্তরে নেমে গেছে যে তাদেরকে আর আলিম বলা যায় না। অত্যন্ত নিচু আর ঘৃণ্য এক অবস্থান যেখানে কোনো আলিমের যাওয়া উচিত নয়। প্রতি রাকআত সলাতে আমরা আল্লাহর নিকট পথনির্দেশনা চাই, এবং আমরা তাঁর নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদেরকে তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না করেন যাদের উপর তিনি রাগান্বিত অথবা যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। যদি প্রতি রাকআত সলাতে আমরা আল্লাহর নিকট এই প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদেরকে তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না করেন যাদের উপর তিনি রাগান্বিত অথবা যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, এবং তারপর আমরা আমাদের মিডিয়া আর রাজনীতিতে বলে বেড়াই যে তারা আমাদের প্রিয়জন এবং আমরা একই এবং তারা আমাদের জাতি গঠনে সাহায্য করতে এসেছে, তাহলে তাদের রাজনীতি আর সলাতের মধ্যে সম্পর্ক কিরকম? আজকে আমেরিকানদের সাথে মৈত্রী সম্পর্ক করা রাজনীতির কোন বিষয় নয়, এটা একটা ঈমানের বিষয়। এটা দ্বীনের কোন ফিক্‌হী বিষয় নয় যাতে লোকেরা মতভেদ করে। তাই এখন যদি তারা আমাদের জিহাদকে সমর্থন না করে বা একে জিহাদ বলে মনে না করে, তারপরেও কিভাবে তারা আমেরিকার জিহাদকে সমর্থন করে আর আমাদের বিরুদ্ধে তাদেরই পাশে গিয়ে দাঁড়ায়? ধরা যাক, আমরা আপনার বিশ্বাসকে ক্ষমা করলাম যে আমাদের জিহাদ আসলে কোন জিহাদ নয়, ঠিক এই মুহূর্তে আরব দেশগুলো হতে আমেরিকার সেনাবাহিনীতে সৈন্য আছে, আরব দেশগুলোর সেনাবাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র, বিমান বাহিনী আমেরিকার বাহিনীর সাথে পাশাপাশি অবস্থান করছে। আইএসএএফ আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, আমরা হতভাগ্য আফগান! তারা আমাদের বিরুদ্ধে তাদের সম্পদ দিয়ে, তাদের অস্ত্র দিয়ে, তাদের সৈন্য দিয়ে যুদ্ধ করছে। ঠিক আছে, যদি আপনারা আমাদের জিহাদকে সমর্থন নাই করেন, আমাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার জিহাদকে কোন্ হিসেবে সমর্থন করছেন? কে সেই আলিম যে আপনাদেরকে এই ফতোয়া প্রদান করেছে?

প্রশ্ন ৭ঃ আমাদের আজ সত্যনিষ্ঠ ও ধর্মপ্রাণ আলিমদের ভীষণ প্রয়োজন। আফগানিস্তানে শুহাদা অপারেশন (যাকে কুফফাররা আত্মঘাতী হামলার নাম দিয়েছে) এখন বেশ বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। এসব অপারেশনের ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি আর ক্রুশের বিরুদ্ধে এই অগ্নিযুদ্ধে এগুলো কি ভুমিকা পালন করে?

যখন আমি কারাগারে ছিলাম, তখন একজন মুজাহিদ একটা টেপ রেকর্ডার সাথে নিয়ে আমার কাছে আসল। সে বলল, "শাইখ আমি এত হাজার দিয়ে এই টেপ রেকর্ডারটি কিনেছি আর এটাকে ভিতরে আনার জন্য আমি গেটের পুলিশকেও ঘুষ হিসেবে এত হাজার দিয়েছি। অনুগ্রহ করে আমার জন্য একটা লেকচার রেকর্ড করে দিন।" তো আমি চিন্তা করছিলাম কি নিয়ে কথা বলা যায় এবং আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে শুহাদা অপারেশন যে আত্মহত্যা হিসেবে নয় বরং তা শুহাদা হিসেবেই বিবেচিত হবে এই বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করব। পশতু ভাষায় আমি এর দলিলগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম আর তা প্রচার করা হয়েছিল, আজও তা পাওয়া যায়। শুহাদা অপারেশনকে আমি শুহাদার সবচেয়ে উঁচু পর্যায়ের মধ্যে গণ্য করি। এবং আমি এমন কিছুও বলব যা আলিমদের মধ্যে "উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন"দের কাছে বিস্ময়কর মনে হতে পারে। আমাদের আধুনিক যুগের ইতিহাসে যারা প্রথম শুহাদা অপারেশন চালিয়েছিল তারা হচ্ছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। আয়ুব খানের শাসনামলে যখন ভারত পাকিস্তানকে আক্রমণ করেছিল, তখন পাকিস্তানের সীমানায় ভারতীয় ট্যাঙ্ক প্রবেশ করেছিল আর লাহোর শহরের পতন ছিল মুহূর্তের ব্যাপার। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ৫০ জনের একটি দলকে ডেকে পাঠালেন, যাদের প্রত্যেকে তাদের শরীরে বোমা বেঁধে নিয়েছিল এবং ভারতীয় ট্যাঙ্কগুলোর নিচে শুয়ে পড়েছিল। তারপর তারা সবাই নিজেদেরকে একসাথে উড়িয়ে দিয়েছিল, সেইসাথে ভারতীয় ৫০টি ট্যাঙ্ক। এতে পাকিস্তানে ভারতীয় আগ্রাসন পরাজয় বরণ করে আর আয়ুব খান যুদ্ধে জয়ী হয়। এইসব শহীদদের পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাদের সর্বোচ্চ স্তরের সম্মাননা "হায়দার ব্যাজ" দ্বারা পুরস্কৃত করেছিল আর তাদের সামরিক ইতিহাসের বইতে এসব সৈন্যদেরকে শহীদদের কাতারেই লিখে রাখা হয়েছে। পাকিস্তানের সমস্ত আলিম আর যারা ফতোয়া দেওয়ার যোগ্যতা রাখেন তারা এসব সৈন্যদের শহীদী মর্যাদা স্বীকার করে নেন। তারা সবাই বলেন যে এসব সৈন্যরা শহীদ এবং তাদের এই অবস্থানের জন্য ইসলামি দুনিয়ার কেউই তাদের

বিরোধিতা করেননি। তাই ফিলিস্তিন, ইরাক এবং আফগানিস্তানে এরকম শুহাদা অপারেশন ঘটার আগে তা পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দ্বারাই ঘটেছে। পাকিস্তানি আলিমগণ তাতে সম্মতিও জানিয়েছিলেন। আমার এই টেপে আমি পাকিস্তানি আলিমদের মধ্যে যারা এই ফতোয়ার বিরোধিতা করেন তাদেরকে একটি প্রশ্ন করেছি। ও সম্মানিত আলিমগণ! যখন আপনাদের মুজাহিদেরা ভারতীয় ট্যাঙ্ক উড়িয়ে দিয়েছিল, আপনারা তাদেরকে বললেন শহীদ। কিন্তু যখন আমাদের মুজাহিদেরা আমেরিকান ট্যাঙ্ক উড়িয়ে দেয়, আপনারা তাদেরকে শহীদের মর্যাদা দিতে অস্বীকৃতি জানান বরং বলেন যে তারা আত্মহত্যা করেছে? কারণ ডলারের কাছে আপনারা আপনাদের ফতোয়া বিক্রি করে দিয়েছেন? এই প্রশ্ন আজও প্রযোজ্য এবং আমি তার পুনরাবৃত্তি করছি। কুরআনে এবং হাদিসে যে সমস্ত দলিল পাওয়া যায় তা সম্পর্কে এই আলিমগণ অজ্ঞ নন। সংক্ষিপ্ততার খাতিরে আমি এসব দলিলের উল্লেখ এখানে করব না। আমি শুধু বলব যে এই অপারেশনগুলো এমনকি অবিশ্বাসীদের কাছেও সম্মানের বিষয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যেসব জাপানী পাইলটেরা সুইসাইড মিশন চালিয়েছিল, তাদের প্লেন দিয়ে আমেরিকান জাহাজ উড়িয়ে দিয়েছিল, তাদেরকে জাপানী ইতিহাসে নায়কের মর্যাদা দেওয়া হয়। এদের মত ব্যক্তিদেরকে অবিশ্বাসীরা তো বটেই, মুসলিমরাও নায়ক হিসেবে মনে করে। আত্মহত্যা করা একজন মানুষ আর শুহাদার সন্ধান করা একজন মানুষের মধ্যে পার্থক্য আছে। যে আত্মহত্যা করে সে জীবনকে ঘৃণা করে, জীবনে তার কোন আশা নেই, তার কোন নৈতিকতা কাজ করে না। সে ব্যর্থ। আর আমরা? আমরা জীবনকে ভালবাসি, আমরা আমাদের স্ত্রীদের ভালবাসি, আমাদের সন্তানদের ভালবাসি এবং জীবনের সুন্দর সবকিছু উপভোগ করতে আমরা ভালবাসি। কিন্তু আমাদের কাছে আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের চেয়েও প্রিয় হচ্ছে আল্লাহর দ্বীন। ক্ষমতা আর ঘরবাড়ির চেয়েও আমাদের কাছে প্রিয় হচ্ছে এই উম্মাহর সম্মান। এমন না যে আমরা আমাদের জীবনের সমস্যা নিয়ে হতাশাগ্রস্ত। যারা আমাদের সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করে যে আমাদের সমস্যা আছে, তারা এসে আমাদেরকে কাছ থেকে দেখুক। আমার তিনজন স্ত্রী আর উনত্রিশজন সন্তান আছে। আমার জীবন আরামপ্রদ আর আমার কোনো সমস্যাও নেই। এবং আমার ইচ্ছা যে জিহাদের নেতারা আমাকে ওই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করুক যে তালিকায় শুহাদা অপারেশন চালাতে আগ্রহীদের নাম আছে এবং বাস্তবেই আমাকে একটি অপারেশন চালানোর জন্য অনুমতি দিক।

প্রশ্ন ৮ঃ আমরা আল্লাহর কাছে আপনার ভালোর জন্য দু'আ করি। আমাদের শাইখ, তালিবান আর আল-কায়েদার মধ্যে বিরাজমান সম্পর্ককে আপনি কিভাবে দেখেন?

এ হচ্ছে এমন এক সম্পর্ক যা ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধের উপর ভিত্তি করে তৈরি, এক দল হিজরত আর সাহায্যের এবং আরেক দল জিহাদের। এটা সবাই ভালো করেই জানে যে তালিবানের উত্থানের পূর্বেই আফগানিস্তানে আল-কায়েদা আগমন করে। শাইখ উসামা এবং তার সহকর্মীদেরকে তালিবানরা চিনত না। তাদের কোনও রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল না, তারা একে অপরকে জানতও না। কিন্তু যখন তালিবানরা বিজয় অর্জন করে এবং ক্ষমতা লাভ করে, তারা ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেয়, তাই এসব মুজাহিদীনরা হিজরত করে এবং তারা এখন আমাদের ভূমিতে বসবাস করছে। সুতরাং আমাদের উপর তাদের এই অধিকার আছে যে আমরা তাদেরকে আশ্রয় দেব, তাদেরকে সাহায্য করব এবং তাদের প্রতিরক্ষা করব। এরই ভিত্তিতে তালিবানরা আল-কায়েদার পাশে দাঁড়ায় আর সেই সাথে তারা তাদের এই অবস্থানের ফলাফলও মেনে নিতে রাজি হয়। তাদের সম্পর্ক আজও অটুট। তালিবান নেতাদের কাছে কিছু প্রস্তাব এসেছিল এরকম যে তাদেরকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে যদি তারা আল-কায়েদার ব্যাপারে সমঝোতা করতে রাজি হয়। কিন্তু তারা এসব প্রস্তাবের কিছুই মেনে নেয়নি। তালিবান এই অবস্থানে অবিচল যে আল-কায়েদা তাদের ভাই। আরব উপদ্বীপের একজন বিখ্যাত আলিম, আমি তার নাম উল্লেখ করব না, আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে "আল-কায়েদাকে যেন বলা হয় আমাদের আনুগত্য করতে নয় তো আমাদের ভূমি ছেড়ে চলে যেতে।" আমি বললাম, "ও সম্মানিত শাইখ, আল্লাহর কসম! নওয়াজ শরীফ বা মুশাররাফও আমাদেরকে এমন প্রস্তাব দেয় নি। আপনি আমাদের উপর আশা করেন যে আমরা এই কথা তাদেরকে বলব?!" তিনি বললেন, "যদি তুমি তাদেরকে এই কথা বল তাহলে কোনও সমস্যা হবে না। আমরা তোমাদেরকে তোমরা যা চাও তাই দিয়ে সাহায্য করব... মুজাহিদদের থেকে তোমাদের নির্দোষ দাবি করার জন্য... হ্যাঁ, শুধু এটুকু ঘোষণা করে দাও।" তালিবানদেরকে তাদের অবস্থানের জন্য দাম শুধু শুরুতেই দিতে হয়েছে তা নয়, আল-কায়েদাকে সহায়তা দেওয়ার জন্য তারা এখনো ভুগছে।

প্রশ্ন ৯ঃ আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন তাদেরকে শেষ পর্যন্ত দৃঢ়সংকল্প রাখেন এবং তাদের শেষ কাজ ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন। কাবুলে অনুষ্ঠিত হওয়া লয়া জিরগা সম্মেলনের বিষয়ে আপনি কি বলেন যার ফলে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে তালিবানদের সাথে সমঝোতা করা হবে? আর তালিবান এবং সরকারের মধ্যে আলাপ-আলোচনার ব্যাপারটিকে সাধারণভাবে আপনি কিভাবে দেখেন?

প্রথমত, লয়া জিরগার ব্যাপারে, যখন বিষয়টি প্রথম টেলিভিশনে আসলো আর মিডিয়া এ নিয়ে অত্যুৎসাহী হয়ে উঠলো, আমার সাথে বসা একজনকে আমি বললাম যে আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, উভয়পক্ষের যারা উপস্থিত ছিল, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান, তারা যুদ্ধের প্রকৃত দুই পক্ষ কিনা? হয় তারা যুদ্ধের দুই পক্ষ অথবা তারা যুদ্ধের দুই পক্ষ হতে মনোনীত মধ্যস্থতাকারী। পাকিস্তান নিজেকে যুদ্ধের কোনো পক্ষ মনে করে না। এমনকি মুজাহিদীনরাও তাদেরকে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে পাঠায়নি। তাহলে তারা কিভাবে সম্মেলনে বসে যখন তারা না যুদ্ধের কোনো পক্ষ না বিশ্বস্ত প্রতিনিধি? শুধুমাত্র বুশের নেওয়া সিদ্ধান্তের কারণেই তারা সম্মেলন আহ্বান করে। এই সম্মেলনে যোগদান করে তারা তাদের প্রভুর নির্দেশ পালন করেছে মাত্র। তাদের সিদ্ধান্ত মানা কারো জন্য শর্ত নয়, বরং তারা শুধু আমেরিকাকে খুশি করতেই ব্যস্ত। সমঝোতার কথা বলতে গেলে, সমঝোতা করা বা শত্রুর সাথে কথা বলাটা আলোচনার কোনো বিষয়ই হতে পারে না। এমনকি এতে কোনো লাভও নেই। আপনি শত্রুর সাথে আলোচনায় বসতে পারেন আর এটা ইতিহাসে ঘটেছে; যুদ্ধের উভয় পক্ষ বসে যুদ্ধের শুরু কখন হবে, নিয়ম নীতি কি হবে, যুদ্ধ কবে বন্ধ করা হবে তা নির্ধারণ করে নিতে পারে, একদিন বিশ্রাম নিয়ে পরের দিন আবার যুদ্ধ শুরু করতে পারে নিঃসন্দেহে এইটি ইতিহাসে ঘটেছে। কিন্তু এখানে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো আমরা শত্রুর সাথে কি নিয়ে আলোচনা করবো? কাবুল সরকারের সাথে আমরা কি আলোচনা করব? এই প্রশ্নগুলো আমি সবাইকে, এর সাথে জড়িত সকল দলকে করতে চাই, এটা কি সম্ভব যে দখলদার আগ্রাসী শক্তিকে আফগানিস্তান থেকে উৎখাত করা হবে? নাকি তাদের উপস্থিতিতে তাদের সাথে আলোচনায় বসা উচিত আমাদের? আমরা যদি কাবুল সরকারের সাথে কোনো রকম বোঝাপড়ায় আসি, যখন কিনা দখলদার শক্তি আফগানিস্তানে এখনও উপস্থিত, তাহলে আমাদের সাথে রব্বানী আর সাইয়াফদের পার্থক্য রইল কোথায়? তখন তো তাদের বিরুদ্ধে তালিবানের কোনো মতপার্থক্য থাকবে না যারা কিনা কাবুল সরকারে যোগ দিয়েছে। আর আমেরিকান ও ন্যাটো বাহিনীর আফগানিস্তান ত্যাগের পর যদি কাবুল সরকারের সাথে আমাদের আলোচনায় বসার কথা আসে, তাহলে আমি জিজ্ঞেস করছি, আমেরিকান আর ন্যাটো বাহিনীর উপস্থিতি ছাড়া কারজাইয়ের পক্ষে আফগানিস্তানে থাকা কি সম্ভব? আমার ভালো রকম সন্দেহ আছে। ওই বাহিনীর পালিয়ে যাওয়ার আগেই সে পালিয়ে গিয়ে ভালো করবে। তাই আমি মনে করি আমাদের মধ্যে কথা বলার জন্য কোন কিছুই অবশিষ্ট নেই। অবাস্তব কোনও সমাধান আমির-উল-মুমিনিন গ্রহণ করবেন না। ওনার সম্পর্কে যতটুকু জানি তাতে এ কথা বলা যায়। এবং তালিবান যোদ্ধাদের সম্পর্কেও এ কথা বলা যায়। তালিবানরা যখন ক্ষমতায় ছিল তখন তারা এ রকম সমাধান গ্রহণ করে নি। এখন যখন তারা ক্ষমতায় নেই তখন তারা এটা কিভাবে গ্রহণ করতে পারে? মিডিয়ায় এই ব্যাপারগুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হয় যাতে তালিবানের বিভিন্ন স্তরের সদস্যদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা যায়। কাবুলে একজন পার্লামেন্ট সদস্য বলেছেন, "আমরা আলোচনার কথা বলছি যাতে তালিবান দুই দলে ভাগ হয়ে যায়, এক দল মধ্যপন্থী, আলোচনায় যেতে ইচ্ছুক আর আরেক দল এর কঠোর বিরোধী। এতে দুই দল নিজেদের মধ্যে পার্থক্য করতে শুরু করবে আর তাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি হবে।" যাই হোক, আমি সবাইকে আশ্বস্ত করতে চাই যে যতদিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর জীবিত আছেন, ততদিন তালিবান বা অন্যদের সাথে এরকম কিছু ঘটার ভয় নেই। কারণ, তিনি সেই ব্যক্তি যিনি এই সমস্ত কিছু শুরু থেকেই পরিত্যাগ করে এসেছেন এবং হাজার হাজার শহীদকে এই কারণে উৎসর্গ করেছেন। এতদূর পর্যন্ত চলে আসার পর তিনি কিভাবে এই আলোচনার প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেন? তিনি এটা শুরুতে মেনে নেননি, শেষে এসে তিনি এটা কিভাবে মেনে নেবেন? যতক্ষণ না পর্যন্ত সমস্ত আগ্রাসী বাহিনীকে আফগানিস্তানের সকল এলাকা থেকে প্রত্যাহার করা না হয়, এবং ইসলামি শাসন আফগানিস্তানে প্রতিষ্ঠিত না হয়, যার জন্য পঁয়ত্রিশ বছরের বেশি সময় ধরে আমাদের রক্ত ঝরছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কাবুল সরকারের সাথে কোনো রকম আলোচনার সুযোগ নেই। আমি এধরণের আলোচনা নিয়ে একজনের সাথে কথা বলছিলাম এবং তাকে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছিলাম। এটি এখন আমি সবার জন্য বলছি যাতে তারা সবাই বুঝতে পারে। আমি বলেছিলাম, মনে করুন একজন ব্যক্তির বাড়িতে আক্রমণ করা হলো। একদল দুষ্কৃতকারী বা ডাকাত একজন ব্যক্তির বাড়িতে আক্রমণ করলো, তার সম্মান, তার স্ত্রী, তার সম্পদ লুণ্ঠন করলো। তারা কিছুদিন তার বাড়িতেই অবস্থান করলো। এরপর তারা বলল, "চলো, আমরা একটা চুক্তি করি।" তো ওই ব্যক্তি রাজি হলো। সে কি তাদেরকে বলবে তার বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে? এই বলে যে, "যেভাবে এসেছ, সেভাবে

চলে যাও...” এটা কিছু হলো? বিচার নেই? এটা কি কোন সমাধান হলো? নাকি সে এরকম সমঝোতা করবে যে সে ডাকাতদের বলবে, “এক সপ্তাহের জন্য এই বাড়ি তোমাদের, পরের এক সপ্তাহের জন্য আমার। আমার সম্পদ আর পরিবার আমরা পালাক্রমে নিয়ে নেবো। আমরা ভাগাভাগি করে নেবো। আমার অর্থের এতটুকু তোমাদের আর এতটুকু আমার।” এটা কি কারো বিচার বুদ্ধিতে খাটে? কোন মুসলিমের বাড়ি আক্রান্ত হলে কোন মানুষ কি এই সমঝোতা মেনে নিতে পারবে? এই যুক্তি কি সে গ্রহণ করতে পারবে? যদি মাত্র একটা মুসলিমের বাড়ির ক্ষেত্রে সে এটি মেনে নিতে না পারে, তাহলে সমগ্র মুসলিম উম্মাহের ক্ষেত্রে সে এটি কিভাবে মেনে নিতে পারে? উম্মাহর সম্মান, তার দ্বীন, তার আভ্যন্তরীণ বিষয়, তার নেতৃত্ব আর তার সম্পদের ক্ষেত্রে সে এটি কিভাবে মেনে নিতে পারে?

প্রশ্ন ১০ঃ কোনো সন্দেহ নেই কারাগারে কাটানো সময় থেকে আপনি অনেক কিছু শিখেছেন। পাকিস্তান আর কাবুলের কারাগারে কাটানো দিনগুলির সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকে শেখা কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে বলুন।

আমি অনেক কিছু শিখেছি এবং আমি মনে করি সেগুলো খুবই উপকারি। প্রথম যে শিক্ষা আমি পেয়েছি তা হলো একজন ইসলাম প্রচারকের জন্য অনুমতি না নেওয়াটাই যৌক্তিক। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমি কিছুই অস্বীকার করব না। কারণ আমি যতই অস্বীকার করি না কেন, তাতে আমার কোনো উপকার হবে না। সবাই আমাকে চেনে এবং মুজাহিদীনদের সাথে আমার সম্পর্কের কথা জানে। তাই আমি কিছু অস্বীকার করি নি। আমি তাদেরকে বলেছিলাম, “হ্যাঁ, আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ হচ্ছে ফারদ-উল-‘আইন।” আমি বিচারক আর মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবী এও বলেছিলাম যে, “তোমাদের উপর জিহাদ হচ্ছে বাধ্যতামূলক। কারণ উম্মাহর উপর এটা বাধ্যতামূলক ইসলামি ভূমিকে মুক্ত করা আর এটি একটি পরিষ্কার ক্রুসেড।” আমি এমনকি উসামার সাথে আমার যোগাযোগের বিষয়টিও অস্বীকার করিনি। যখন তারা আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে আমি উসামাকে চিনি কিনা, আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ। যখন তারা আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে তার সাথে আমার কি সম্পর্ক, আমি বলেছিলাম, সে আমার জিহাদি বন্ধু। লোকেরা এটাকে অদ্ভুত কাজ বলে মনে করে। কেউ কেউ এটাও বলে যে আমি বিশৃঙ্খল আর বেপরোয়া ইত্যাদি... অথবা আমি রাজনীতি বুঝি না। কিন্তু আমি এর পরিণাম দেখেছি যা হচ্ছে দাওয়াহ। যখন আমি তাদেরকে কোন সত্য কথা বলেছি, তারা বিশ্বাস করতো, এমনকি তারাও যারা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতো। কারাগারে আমার প্রবেশ করার সময় থেকে আমার বের হয়ে আসার সময় পর্যন্ত আমার সাথে কেউ তর্ক করেনি, তারা মেনে নিয়েছিলো যে আমরা সত্যের উপর আছি আর তারা মিথ্যার উপর আছে। তারা ক্ষমা চাইত, এমনকি পাকিস্তানিরাও যারা আমাকে হাতকড়া পড়িয়েছিল তারা আমার হাতে চুমু খেয়ে তাদের জন্য দু‘আ করতে বলতো। এই ছিল তাদের উপর দাওয়াহর ফলাফল। আরেকটি সুবিধা আমি পেয়েছিলাম এভাবে যে তারা আমাকে ভয় পেতো। তারা জানতো যে আমি মুজাহিদীনদের প্রতিনিধিত্ব করছি। তাই আমি তাদেরকে হুমকি দিতাম। আমি তাদেরকে বলতাম যে, “আল্লাহর কসম! তোমরা যদি আমার কিছু কর তাহলে আমি তার দশগুণ করব। আমি মুজাহিদীনদের বলে দেবো আর তারা তোমাদের সাথে এই এই করবে।” এজন্য তারা আমাকে ভয় পেতো। একমাত্র বিপদ যেটা ছিল তা হলো আমাকে কারাগার থেকে ছাড়া হতো না বা আমাকে লম্বা সময় ধরে কারাগারে থাকতে হচ্ছিলো। আমার কাজের ধারায় এই ছিলো একমাত্র বিপদ। তাই আমি ভাইদেরকে বলবো, “আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের যাত্রায় আমরা আল্লাহর সাথে হেঁটে চলেছি। তিনি কি আমাদেরকে প্রতিরক্ষা আর সহায়তা না দিয়ে ছেড়ে যাবেন?” সবকিছু সত্ত্বেও আমি এরপর কারাগার থেকে ছাড়া পেলাম। তাই আমি আপনাদের এই চ্যানেলের মাধ্যমে তাদের সবাইকে বলছি, বিশেষ করে কাবুলে এবং কারাগারে যারা আমাকে ভয় দেখাতে চেষ্টা করতো এইভাবে কাজ না করার জন্য। আমি তাদের সবাইকে বলছি, তোমরা কি শোননি কিভাবে আমার প্রভু আমাকে মুক্ত করেছেন? তোমরা কি দেখনি কিভাবে আমার প্রভু তোমাদের প্রভুর চেয়ে বেশি সামর্থ্যবান? আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করি, তোমরা কি এটা অনুধাবন করতে পারছো না যে সত্যবাদিতা মিথ্যার চেয়ে বেশি সফল হয়? তোমরা কি দেখনি যে এই বিষয়ে কাজের শক্ত ধারা অবলম্বন করাটাই অনুমতি নেওয়ার চেয়ে বেশি সহজ। এই কারণে আমি তাদেরকে বলি যে কারাগারে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা ভীরু কাপুরুষদের জন্য একটা শিক্ষা।

প্রশ্ন ১১ঃ আমরা আল্লাহর কাছে দু‘আ করি আপনাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য, আমাদের শাইখ। আমি নিশ্চিত যে কারাগারে অনেক মর্মস্পর্শী ঘটনা ঘটেছে। আপনি কি এরকম কিছু ঘটনা যা আপনি আপনার বন্দী সময়ে প্রত্যক্ষ করেছেন, আমাদেরকে বলবেন?

হ্যাঁ, অনেক। অনেক কিছু ঘটেছে। একবার আমি একটা টর্চার সেন্টারে ছিলাম আর ওরা এক আরব ভাইকে নির্যাতন করছিল। আমি তার আর্তনাদ শুনতে পেতাম আর এতে আমার খুব কষ্ট অনুভব হতো। আমার ঘুমাতে খুব কষ্ট হতো। আমি ঘুমাতে পারতাম না। আমি পড়াশোনা করতে পারতাম না। এমনকি আমি সলাতে মনোযোগও দিতে পারতাম না। কল্পনা করুন, আপনি একটা রুমে আছেন আর আপনার পাশের রুমের লোকটা অত্যাচারে চিৎকার করছে। এটা ছিল আমার জন্য নির্যাতনের একটা চরম পন্থা। আমি দুই দিন ঘুমাতে পারিনি আর আমার ভয় করছিল যে আমি হয়তো পাগল হয়ে যাবো। তারপর আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম যে আল্লাহর রসূল ﷺ, একটা শ্রেণীকক্ষে আমাকে শিক্ষাদান করছেন, আর ওই যুবক ভাইও আমার সাথে শ্রেণীকক্ষে বসে আছে। আল্লাহর রসূল ﷺ তার দিকে লক্ষ্য করে বললেন, "তুমি আমার বার্তাবাহক।" এই কথাটাই, "তুমি আমার বার্তাবাহক।" এই ভালো স্বপ্নের কারণে যখন আমি ঘুম থেকে উঠলাম, তখন আমার সমস্ত দুঃখ, কষ্ট, চিন্তা আর ভয় যা সবকিছুতে আমি ভুগছিলাম তা হালকা হয়ে গেল। যখনই কঠিন সময় পার করতাম, আমরা স্বপ্ন দেখতাম যা আমাদের বোঝা হালকা করে দিতো আর আমাদের সুসংবাদ দিতো। এটা ছিল একটা ঘটনা। আরেকটা ঘটনা ছিল আমার ওই ক্যাসেট নিয়ে যার উল্লেখ আমি করেছি শুহাদা অপারেশনের ব্যাপারে। যখন আমি ক্যাসেটটা রেকর্ড করা শেষ করি, কেউই সেটা প্রচার করতে রাজি হয়নি। এমনকি তারা এটি তাদের সাথে নিতেও রাজি হতো না। তারা বলতো যে আমাকে এর জন্য সমস্যায় পড়তে হবে, আমাকে নির্যাতন করা হবে ইত্যাদি। কেউই আমাকে সমর্থন করেনি। আমি স্বপ্নে দেখলাম যে আমি একটা দুর্ঘটনায় পড়েছি। আমি চর্বির সাথে মাখন মাখাচ্ছিলাম। আমি সেটা আগুনের উপর রাখলাম যতক্ষণ না পর্যন্ত তা টগবগ করে ফুটতে থাকে। আমি তা একটা বোতলে ঢালছিলাম, আর চর্বি আমার এই হাতে ঢেলে পড়লো, সবটুকু। কিন্তু তাতে আমার হাত পুড়ে গেলো না। আমি কোন ব্যথা অনুভব করলাম না, না আমার চামড়ার পরিবর্তন হলো। আমার প্রভু আমাকে এই অলৌকিক ঘটনা দেখালেন, যাতে আমি সত্য কথা বলার ব্যাপারে তাদেরকে ভয় না করি। এই কারণে, জেল থেকে বের হবার পর আমি ভয়মুক্ত হয়ে গিয়েছি। লোকেরা যদি আমাকে বাতিকগ্রস্ত না বলতো, তাহলে আমি আমাকে এসব মিলিটারি বেসে আটকে রাখতাম না। কারাগারের অভিজ্ঞতা আমার সাহসকেই শুধু বাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ অসংখ্যবার আমরা আল্লাহর সাহায্য পেয়েছি। আমাদের যখন কোন খাবার থাকতো না, তিনি আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করে দিতেন। ক্ষুধার সময়ে এমন একজন এসে আমাদের খাবার দিয়ে যেতো যাকে আমরা কখনোই চিনতাম না। অনেক কিছু ঘটেছে। এমনকি অনেকে যাদেরকে মারধর করা হতো, নির্যাতন করা হতো, আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছি, তাদের অনেকে বলেছিল যে তারা কোন কষ্ট অনুভব করতো না। তাই আমি লোকদের সাহস দেই যেন তারা কারাগারকে আর এসব কাঠেরপুতুল শাসকদের ভয় না পায়। কারণ আল্লাহ তাদেরকে গায়েব থেকে এমনভাবে সাহায্য করবেন যে তারা কখনো কল্পনাও করতে পারবে না। কিন্তু এটা প্রথমেই আসবে না। এটা তখনই আসে যখন একজন ব্যক্তি আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকে। যেরকম ইব্রাহীম ﷺ প্রস্তুত ছিলেন যখন তাকে আগুনে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল। শুরুতেই এরকম ঘটে না। একজন মুসলিম নিজেকে তৈরি করে এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য, আর যখন আমাদের প্রভু তার মধ্যে আন্তরিকতা দেখতে পান, তিনি তার জন্য পথ সহজ করে দেন। এরকম অনেক পরিস্থিতি ছিল। আরেকটা ব্যাপার আমাকে খুব কষ্ট দিয়েছিল। তারা এক আহত আফগানিকে নিয়ে আসলো যে অজ্ঞান ছিল। সে কিছুই অনুভব করছিল না। তারা তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দিলো যখন সে জ্ঞানশূন্য ছিল। আর তাকে কারাগারের মেঝেতে ফেলে রাখলো। তার হাতে সূচ ফুটানো ছিল, তার জ্ঞান ছিল না আর তারা তাকে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে রাখলো। আমি তাদেরকে বললাম, "তাকে হাসপাতালে পাঠাও।" কোথায় তোমাদের সেই মানবাধিকারের বুলি? আর কোথায় গেল তোমাদের অসুস্থ মানুষের অধিকারের কথাই? আরেকটা ব্যাপার যা আমাকে খুব কষ্ট দেয় তা হলো আজকে কাবুল কারাগারে অনেক মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষ রয়েছে। আমি তাদেরকে বললাম, "আব্দুর রহমান, যে খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিলো আর আফগানিস্তানে বন্দী ছিল, তাকে তারা ছেড়ে দিলো ভারসাম্যহীনতার অজুহাতে। আর অন্যান্য লোকদের কি হলো? হয় তোমরা তাদেরকেও ছেড়ে দাও যেমন করে খ্রিস্টান আব্দুর রহমানকে ছেড়ে দিয়েছ, তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যাও কারণ তারা মানসিক ভারসাম্যহীন অথবা কারাগারে একটা মানসিক বিভাগ তৈরি কর যাতে তারা সঠিক পরিচর্যা পেতে পারে।" সবশেষে, পুলি চারকি নামে আমি একটা লেকচার রেকর্ড করেছিলাম, যেখানে আমি দাবি করেছিলাম যে, কাবুল সরকার যেন পুলি চারকির কারাগারে বন্দীদের অন্তত সেই অধিকারটুকু দেয় যেটা চিড়িয়াখানার পশুপাখিদের দেওয়া হয়।

প্রশ্ন ১২ঃ আমাদের শাইখ, ইসলামি বিশ্বে জিহাদের আর মুজাহিদীনদের নেতাদের প্রতি আপনার উপদেশ কি?

যে ভুল আমরা করেছিলাম সেই একই ভুল করা থেকে আমি তাদের সাবধান করছি। আমাদের এইসব ভুলের স্বীকার হতে হয়েছিল কেবলমাত্র আমাদের মতপার্থক্যের কারণে, নেতৃত্বের পার্থক্যের কারণে,আর বিভিন্ন বিষয়ে তাদের ঐক্যহীনতার কারণে। সমর্থন কম এরকম একজন ব্যক্তির অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সমর্থন বেশি এরকম একজন ব্যক্তিকে নিয়ে মতভেদ করার চেয়ে উত্তম। আর বিভক্ত হয়ে একে অপরের সাথে যুদ্ধ করার চেয়ে এটাই ভালো। আমি তাদেরকে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী একত্রিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। এখানে যখন কিছু মুজাহিদীন নেতাদের সাথে আমার দেখা হতো আমি তাদেরকে বলতাম যে ঐক্যবদ্ধতার বিষয়ে তাদেরকে ন্যাটোর মত হওয়া উচিত। বিভিন্ন নেতাদের একত্রিত হওয়া উচিত ন্যাটোর অধীন বিভিন্ন জাতির মত, একই পতাকার তলে যুদ্ধরত, একজন কেন্দ্রীয় নেতার নির্দেশ অনুযায়ী, একই সামরিক শক্তির অধীনে, একই অর্থনৈতিক উৎসের সাহায্যে, একটাই যুদ্ধ করা উচিত। তারা আফগানিস্তানকে বিভিন্ন রাজ্যে ভাগ করেছে, প্রতিটি জাতিকেই একটি রাজ্য দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারা সবাই একই নেতৃত্বের অধীনে। **"যদি না তোমরা এরূপ কর, কোলাহল আর অত্যাচারে এ পৃথিবী ভরে যাবে, বিশাল ফিত্না সৃষ্টি হবে।"** [সূরা আনফাল, আয়াত ৭৩]

প্রশ্ন ১৩ঃ আমাদের শাইখ, এতে কোন সন্দেহ নেই যে সম্প্রতি কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে গিয়েছে। যার মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হয়ে থাকবে লাল মসজিদের ঘটনা। এসব ঘটনা সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

আমি এই বিষয় নিয়েও পশতু ভাষায় একটি লেকচার রেকর্ড করেছি এবং এটি পাওয়া যাচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি যে বাবরি মসজিদের ঘটনার চেয়ে লাল মসজিদের বিপর্যয় সবদিক থেকেই ভয়াবহ; শহীদের সংখ্যার দিক দিয়ে, যেসব বিভিন্ন প্রকার অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে তার দিক দিয়ে, আর আক্রমণ ও আগ্রাসনের পদ্ধতির দিক দিয়ে। বাবরি মসজিদের চেয়েও লাল মসজিদের ঘটনা অত্যন্ত ভয়াবহ ও বিপর্যয়কর। আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছি। এর চেয়েও বেশি বিপর্যয়কর ব্যাপার ছিল আলেমদের নীরবতা। শত শত অথবা হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হলো। বলা হয় যে মসজিদের তিন হাজারের মত পুরুষ আর নারী শিক্ষার্থীকে হত্যা করা হয়েছে। আমি মিডিয়াকে জরিপ করতে উপদেশ দেই যে দুটি মাদ্রাসায় কত জন পুরুষ আর নারী শিক্ষার্থী ছিল, কতজন এখন কারাগারে আটক আছে, কতজন জীবিত বের হয়ে আসতে পেরেছিল, আর কতজন শহীদ হয়েছে তার উপর। একটি পরিচ্ছন্ন জরিপে বেরিয়ে আসবে মসজিদে হতাহতের সংখ্যা। এই আক্রমনে বিশাল সংখ্যক হতাহতের ঘটনা সত্ত্বেও, ধর্মনিরপেক্ষতা আর রাজনীতির জন্য এটি একটি লজ্জাহীন অপমান হওয়া সত্ত্বেও, এই বিষয়ে পাকিস্তানের আর উম্মাহের আলেমদের নীরবতা ছিল আরও ভয়াবহ দুর্যোগ। লক্ষ্য করুন, ইউরোপ আর আমেরিকার সমস্ত আন্তর্জাতিক কমিটিগুলো নিশ্চুপ ছিল আর তারা এর সমালোচনা বা বিরোধিতা করেনি। তারা এর দিকে মনোযোগও দেয়নি। লাল মসজিদে একটা মুরগির খামারেও যদি বোমা হামলা করা হতো, তাহলে প্রাণী অধিকার আর মানবাধিকার নিয়ে আন্দোলনকারী ব্যক্তিরা এমনকি জাতিসংঘও তা প্রত্যক্ষভাবে প্রত্যাখ্যান করতো। যখন কোন বনে একটা প্রাণী দুর্ভোগে পড়ে, তারা তাদের শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে, আর বলে যে প্রাণীদেরকে তাদের প্রাপ্য অধিকার দেওয়া হয়নি। এইসব মানুষগুলো কি প্রাণী অধিকার পাওয়ারও যোগ্যতা রাখে না যে তাদেরকে এইভাবে হত্যা করা হলো? এই ঘটনার কিছুদিন আগে আমার মনে আছে একদল ব্যক্তি মুরেতে একটি খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলে আক্রমণ চালিয়েছিল আর আমি শুনেছিলাম যে পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশের আলেমগণ একে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তারা রেডিওতে বলেছিলেন যে, এগুলো হচ্ছে ইবাদতের কেন্দ্র, আর ইবাদতের স্থানগুলোতে আগ্রাসন চালানোর অনুমতি নেই। কেননা এগুলো পবিত্র জায়গা... ধর্মের জন্য সম্মান... বিভিন্ন ধর্মের সহাবস্থান... কত কিছু তারা বলেছিলো! আল-জাজিরা চ্যানেলে আখতার মিন রায় (একের বেশি মতামত) অনুষ্ঠানে এক ভাইয়ের করা প্রশ্ন আমার ভালো লেগেছিল। সে বলেছিল, "আমি মুশাররফকে প্রশ্ন করছি, যদি এটা একটা চার্চ হতো, তাহলে কি তারা এটার উপর সেরকম বোমা হামলা চালাতে পারতো, যেমনটা তারা চালিয়েছে এই মসজিদের উপর?" তার কখনও সামর্থ্যই হবে না। আমি এটাকে পাকিস্তানি সরকারের সাংঘাতিক অনেক রাজনৈতিক ভুলের একটা বলে মনে করি, আর এ কারণে সরকারের জন্য আরও অনেক সমস্যার দরজা খুলে যাবে। ব্রিটিশ শাসনামল থেকে আলেম সমাজ আর ব্রিটিশদের মধ্যে কিছু চুক্তি ছিল যা এ দেশে মেনে চলা হতো, চুক্তিগুলো এরকম ছিলো যে ইংরেজরা ধর্মীয় মাদ্রাসা আর মসজিদগুলোর ক্ষতিসাধন করবে না আর আলেমগণ ধর্মীয় মাদ্রাসা আর মসজিদগুলোর ক্ষেত্র থেকে বের হবে না। তাদেরকে এই অধিকার দেওয়া হতো যে তারা তাদের মাদ্রাসা আর মসজিদগুলোতে তাদের ইচ্ছামত কথা বলতে পারবে। কিন্তু আজ এই আগ্রাসনের মাধ্যমে তারা এই সমঝোতা ভেঙ্গে ফেলেছে। কারণ তারা একটি মসজিদের ভেতরে অবস্থিত একটি ধর্মীয় মাদ্রাসায় আক্রমণ চালিয়েছে। আমি একে একটি ধর্মনিরপেক্ষ

উগ্রপন্থা বলে মনে করি। যারা আমাদেরকে উগ্রপন্থী বলে আমি তাদের সবাইকে বলছি, বরং তারাই হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ উগ্রপন্থী। কেননা তারা ধর্মনিরপেক্ষতার উপহাসের সীমা অতিক্রম করে ফেলেছে।

প্রশ্ন ১৪ঃ আমাদের শাইখ, আমরা জিহাদ আর মুজাহিদীনদের বিষয়ে ফিরে যাচ্ছি। আজকে আফগানিস্তান এবং ইরাকে মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকানদের অবস্থা কিরকম?

যখন আমেরিকা ইরাক আক্রমণ করেছিল, আমরা তখনই আফগানিস্তানের ঘটনা নিয়ে অত্যন্ত মর্মাহত ছিলাম। আর যেই মুহূর্তে আমি টেলিভিশনে ইরাকের উপর আক্রমনের খবর শুনি, তা ছিল আমার জন্য কঠিনতম সময়গুলোর মধ্যে একটি। এটা ছিলো অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমি আমার ভাইদেরকে বলতাম, "আল্লাহর জন্যই সমস্ত মহিমা। আমরা আফগানিস্তানের দুঃখে কাঁদছিলাম; কিন্তু এখন আমরা ইরাককেও হারিয়ে ফেললাম?" আমাদের কোন ধারণাই ছিলো না যে এই আক্রমণ আমাদের জন্য ইরাকে বিজয় আর জিহাদের রাস্তা খুলে দেবে। ইসলামি জাগরণ আর জিহাদের কথা বলতে গেলে ইরাক ছিল আরব দেশগুলোর মধ্যে দূর্বলতম একটি দেশ। কারো ধারণাও ছিলো না যে এইভাবে একদল মুজাহিদীন জেগে উঠবে আর আমেরিকান উপনিবেশবাদকে প্রতিহত করবে। আমি বলি যে, আজকে ইরাকে আমেরিকার উপস্থিতি মুজাহিদীনদের স্বার্থেই কাজ করছে। কারণ তারা ফাঁদে আটকা পড়েছে। আর তারা যত লম্বা সময় ইরাকে থাকবে, তারা ততই পরাজিত হতে থাকবে, নৈতিকভাবে, শারীরিকভাবে আর অর্থনৈতিকভাবে। এটা হচ্ছে প্রথম সুফল। দ্বিতীয় সুফল হচ্ছে এটা যে তারা ইরাকের তেল চুরি করার অভিপ্রায় করেছিলো কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। এতে তাদের অর্থনীতির কোনো সাহায্য হয়নি, তেল সরবরাহের বদলে এটা তাদেরকে রক্ত সরবরাহ করেছে। তারা এ থেকে কোনোরকম সুবিধা নিতে পারেনি, আর এভাবে চিন্তা করলে আমরা কিছুই হারাইনি। আরেকটা ব্যাপার এরকম যে, আগে আরবের যুবকেরা আফগানিস্তানে আসতো জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য, প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য, জিহাদের জীবন যাপন করে তাদের অন্তরকে শান্তি প্রদান করার জন্য। কিন্তু তারা অনেক সমস্যারও মুখোমুখি হতো; ভাষা, যোগাযোগ, আর দূরত্বের কারণে। কিন্তু এখন আমাদের প্রভু আরব ইসলামি দুনিয়ার কেন্দ্রেই তাদের জন্য যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছেন। আমি এটা দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহর ইচ্ছা, ইরাকের মুজাহিদীনরা শুধুমাত্র ইরাকের জন্যই যথেষ্ট নয়, সমগ্র আরব দুনিয়ার জন্যই তারা যথেষ্ট। তাদেরকে নিয়ে আমার একটাই ভয় কাজ করে আর তা হলো বিভিন্ন দলের ভেতরে না লড়াই শুরু হয়ে যায়। আমি আশা করি আমাদের সাথে, আফগানিস্তানের মুজাহিদীনদের সাথে যা হয়েছে, তাদের সাথে সেরকমটি ঘটবে না। আমাদের ভুলভ্রান্তি থেকে তাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। আফগানিস্তানের ব্যাপারে আমি কিছুদিন আগে একটি ব্রিটিশ পত্রিকায় পড়েছি যে, ব্রিটেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও আফগানিস্তান আর ইরাকে বেশি ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। তারা এখন তাদের পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছে। আর আল্লাহর ইচ্ছায় তারা খুব শীঘ্রই সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হবে। আর তাদের পরিণাম হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতই। তাদের হিসাব নিকাশ ভুল প্রমানিত হয়েছে।

প্রশ্ন ১৫ঃ শাইখ, আপনার অভিমত কি এই ব্যাপারে যে ইরাক আর আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দুটি যুদ্ধ আসলে একই ষড়যন্ত্রের অংশ? এই দুটি যুদ্ধের মধ্যে সম্পর্ক কি রকম?

ব্যাপারটা শুধুমাত্র ইরাক বা আফগানিস্তানেই সীমিত নয়, বরং এটা ইসলামি উম্মাহের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের আগ্রাসনেরই একটা অংশ। আমরা একটা আধুনিক খ্রিস্টান ক্রুসেডের মুখোমুখি হয়েছি যেখানে খ্রিস্টান আর ইহুদীরা একসাথে জোট বেঁধেছে। প্রথম ক্রুসেড ছিল শুধুমাত্র খ্রিস্টানদের আগ্রাসন, কিন্তু আজকে এটা হচ্ছে ইহুদী-খ্রিস্টানদের ধর্মনিরপেক্ষ ক্রুসেড। আর তাদের সাথে আছে মুনাফিকেরা এবং তাদের চররা। প্রথম ক্রুসেডের চেয়ে এটা অনেক বেশি আগ্রাসী। সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদের বিরুদ্ধে তারা সবাই তাদের বাহিনী একত্রিত করেছে। এটা একটা সম্পূর্ণ যুদ্ধ, তাদের নেতা একটাই, তাদের সৈন্যবাহিনী একটাই, তাদের আর্থিক যোগানদাতা একটাই, তাদের পরিকল্পনা এক, এবং তাদের রাজনীতিও এক। দেখুন, তারা কিভাবে আমাদের সমস্ত কারাবন্দীকে একই জায়গা, গুয়ানতানামোতে রাখছে। ইরাকি, ইন্দোনেশিয়ান, মালয়েশিয়ান, আফগানি, বা পাকিস্তানি সবাই। এটা একটাই ব্যাপার, ভিন্ন ভিন্ন নয়। মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু তারা তাদের বিরুদ্ধেই আগে ক্রুসেড শুরু করেছে যারা ইসলামকে প্রতিরক্ষা করতে প্রস্তুত রয়েছে। সমস্ত আগ্রাসনেরই এই একই নিয়ম। আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনী প্রথমে তাদেরকেই আক্রমণ করে যারা তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে লড়াই করতে আসে। নিজের ঘরে ঘুমন্ত মানুষের তোয়াক্কা তারা করে না। কারণ নিজের ঘরে যারা ঘুমাচ্ছে, যারা খাওয়া-দাওয়া নিয়েই ব্যস্ত, তাদের সাথে যুদ্ধ করাটা তাদের স্বার্থ রক্ষা করবে না। আজকে সমস্ত মুসলিম এই যুদ্ধের

অংশ। এ কারণে, তারা একে বলার চেষ্টা করে যে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। যাতে সাধারণ মানুষ তাতে কান না দেয় এই মনে করে যে এটা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়। এই যদি না হয় তাহলে ইরাক আর আফগানিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক কোথায়? আফগানিস্তান উসামা আর আল-কায়েদাকে আশ্রয় দিয়েছে, তারা কি ইরাকে ছিল? তালিবানদের "উগ্রপন্থী ইসলামি আন্দোলন" তো আফগানিস্তানে ছিল। তাহলে সাদ্দামের সাথে তাদের সমস্যা কোথায় ছিলো যখন কিনা সে তাদের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রেখেছিল আর সে তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই কাজ করতো? তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইরাকের উপর আর আফগানিস্তানের উপর আক্রমণের মধ্যে কোন মিল নেই। মিল ছিল একটাই যে, মধ্যপ্রাচ্যে ইরাকি সৈন্যবাহিনীই ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী আরব সৈন্যবাহিনী আর তারা ছিল ইহুদীদের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। ইরাক ছিল সামরিকভাবে আর প্রযুক্তিগত দিক থেকে অগ্রসর, আর সে ইহুদী আর খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। তারা চায়নি এই সৈন্যবাহিনীর অস্তিত্ব থাকুক, তাই তারা একে ধ্বংস করেছে। তাই আমি পাকিস্তানকে বলছি যে তাদের সাথেও একই ব্যবহার করা হবে যেমনটা করা হয়েছে ইরাকি সৈন্যবাহিনীর সাথে। আমি পাকিস্তানকে বলছি তারা যতই আমেরিকার স্বার্থে কাজ করুক না কেন, আমেরিকা কখনই পাকিস্তানে ইসলামিক মাদ্রাসা বা একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী বা আণবিক বোমার অস্তিত্ব বরদাশত করবে না। তারা পাকিস্তানের আণবিক বোমা থেকে নিস্তার পেতে চায়, কারণ তা ছাড়া একটি শক্তিশালী আর উন্নত ইসলামিক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থেকেই যাবে। যদিও এই বোমা অনুগত মুসলিমদের হাতে নেই, তারপরেও এটা ইহুদী আর আমেরিকানদের জন্য হুমকি আর তারা এটা ধ্বংস করতে চাইবেই। এ জন্যই তারা পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীকে তাদের জনগণের বিরুদ্ধেই দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। যে সৈন্যবাহিনীর মন্ত্র ছিল এরকম, "ঈমান, ধার্মিকতা এবং আল্লাহর জন্য জিহাদ", যে সৈন্যবাহিনী ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয় লাভ করেছে, যে সৈন্যবাহিনীকে সবাই সম্মান করতো, তা এখন নিজেদের লোকদের দ্বারাই বন্দী। তারা কি এটা দেখতে পাচ্ছে না যে এটা ছিলো পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে আমেরিকান ষড়যন্ত্রের প্রথম আঘাত? তাদের বুদ্ধিতে এটা খাঁটা উচিত। যারা এই উম্মাহর স্বার্থরক্ষার জন্য নিবেদিতপ্রাণ, তাদের উম্মাহ, তাদের দেশ, তাদের কথা শোনা উচিত। তোমাদের বিশ্বাসঘাতকদের থামাও আর তাদেরকে ইসলামি উম্মাহ আর মুসলিম জনগণের স্বার্থ নিয়ে খেলতে দিয়ো না!

প্রশ্ন ১৬ঃ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে হামলায় দশটির মত পাশ্চাত্য রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করছে। তারা আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে কেন জোট বেঁধেছে? এই সব রাষ্ট্রের জনগণের প্রতি আপনার বার্তা কি?

আমাদের আগের যুদ্ধগুলোতে ইউরোপ, পাশ্চাত্য আর আমেরিকা সবাই কমিউনিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমাদেরকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। কিন্তু তাদের কোন ধারণা ছিল না যে আমরাই জয়ী হয়ে ফিরে আসবো। তারা বলতো যে কমিউনিস্ট হোক বা মুজাহিদীন হোক, যেই মারা যাবে উভয় ক্ষেত্রেই তাদের লাভ। তারা কোন দিক দিয়েই খুব বেশি ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হবে না। তারা অর্থনৈতিক ভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, কারণ যে অর্থ আফগানিস্তানের জিহাদে খরচ হয়েছে তা ইসলামিক দুনিয়া থেকেই এসেছে। তারা না অর্থ হারিয়েছে না জীবন। তারা আফগানিস্তানের জিহাদের পক্ষাবলম্বন করেছে তাদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্যই, যাতে তারা কমিউনিস্টদের হুমকি থেকে স্বস্তি পেতে পারে। তাই তারা মুজাহিদীনদের বিজয় লাভে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল, মুজাহিদীনদের দ্বারা একটি জাতি গঠিত হতে দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল, আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল এরপর ইসলামি রাষ্ট্র গঠিত হতে দেখে। সোভিয়েতদের পতনের পর তারা এটা বুঝতে পেরেছিলো যে জিহাদে বিশ্বাস করা ইসলাম তাদের জন্য পরবর্তী হুমকি। আর এজন্যই তারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আমেরিকান ইসলাম তাদের জন্য হুমকি নয়, সেজন্য তারা এই আমেরিকান ইসলামকে গ্রহণ করেছে। যে ইসলাম জিহাদে বিশ্বাস করে তাকেই তারা চরমপন্থা আর সন্ত্রাস হিসেবে অভিহিত করে। তারা দেখলো যে আফগানিস্তান হচ্ছে এই জিহাদের প্রথম ভিত্তিস্থল আর প্রশিক্ষণশালা। তাই তারা আফগানিস্তান দিয়েই শুরু করেছে। কেননা তারা জানতো যে মুজাহিদীনরা সেখানে অবস্থান করছে, জিহাদের তেজস্বিতা সেখানে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, এবং জিহাদের জন্য সেখানে ক্ষেত্র আর অস্ত্র দুটোই প্রস্তুত রয়েছে। মুজাহিদীনরা এটাকে তাদের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করতে পারে, তারা যেভাবে ইচ্ছা সেখানে ফিরে আসতে পারে। আর এটা বাস্তবেই হয়েছে। এভাবে আমেরিকা আর পাশ্চাত্য আফগানিস্তানের উপর তাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছে। যাতে তারা এই জিহাদি জাগরণকে আঘাত করতে পারে আর রাজনৈতিক পটভূমি থেকে এটাকে মুছে ফেলতে পারে। তারা অর্থনৈতিক লাভের আশায় ইরাককেও আক্রমণ করেছে কেননা এটা একটা অর্থনৈতিক যুদ্ধও বটে। আফগানিস্তান হচ্ছে মূল্যবান খনিজ সম্পদের দিক থেকে ধনী দেশগুলোর একটি আর ইরাক হচ্ছে তেল সম্পদের আধারের দিক দিয়ে সবচেয়ে ধনী

দেশ। আমেরিকা তার অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্বের পথে হাঁটছে, তাই সে চিন্তা করলো যে যদি সে আফগানিস্তান আর ইরাকে তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে তাহলে সে তার অর্থনৈতিক শক্তিকে পুনরুদ্ধার করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে হয়েছে ঠিক তার উল্টো।

প্রশ্ন ১৭ঃ হ্যাঁ শাইখ, এ রকমটি হয়েছে পাশ্চাত্যের দেশগুলোর ব্যাপারে। এই দেশগুলোর জনগণের উদ্দেশ্যে আপনার বক্তব্য কি?

আমি তাদেরকে বলি তারা হচ্ছে দূর্বল লোকজন আর করুণার পাত্র। তাদের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের ওয়াকিবহাল হওয়া উচিত। তাদের উচিত তাদের যুবকদের জীবন রক্ষা করা। তারা কেন আমাদের সাথে যুদ্ধ করছে? তারা কেন তাদের পুত্র কন্যাদের নিয়ে সিংহের ডোরায় প্রবেশ করছে? তারা কি অর্জন করছে? আমি তাদেরকে বলি ইসলামি দুনিয়ায় বুশের আক্রমণের কারণে পাশ্চাত্য যে পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছে, তাতে তারা এই দুই দেশে তাদের অর্জিত পাশ্চাত্য উপনিবেশের সমস্ত কিছুই হারিয়ে ফেলেছে। তারা কি হারিয়েছে? এর আগে বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের কারণে ইসলামি দুনিয়া মনে করতো যে পশ্চিমা দুনিয়া তাদের আপনজন, ...তারা আহলে কিতাব, ...শান্তিপ্রিয় মানুষ যাদের সাথে আমাদের শান্তিচুক্তি আছে, তারা আমাদের দেশ গঠনে সাহায্য করেছে, তারা আমাদের শত্রু নয়। মানুষ এই রকমই চিন্তা করতো। তারা কমিউনিজমকে বেশি হুমকি মনে করতো। কিন্তু পশ্চিমাদের এই আগ্রাসনে, এই পৃথিবী, এই মুসলিমরা, এই জনগণরা নিজ থেকে দেখলো যে আমেরিকার আক্রমণ আর আমেরিকার শয়তানি সোভিয়েত বাহিনীর শয়তানির চেয়েও খারাপ। আর তাদের ব্যবহারও অনেক বেশি আপত্তিজনক। ইসলামি দুনিয়ার মানুষ এখন পশ্চিমা আর আমেরিকার মানুষদের উন্নত আর সভ্য মানুষ মনে করার বদলে ঘৃণা আর শত্রুতার চোখে দেখে। পশ্চিমারা দুনিয়াব্যাপী তাদের এই ভাবমূর্তি হারিয়ে ফেলেছে। মুসলিমরা তাদেরকে এখন আগের চেয়ে নীচ মনে করে। এই ক্ষেত্রে তাদের সাধারণ জনগণ, তাদের সৈন্যবাহিনী, আর তাদের রাজনৈতিক ও শিক্ষামূলক স্থাপনাগুলো, সবই পরাজয় বরণ করেছে।

প্রশ্ন ১৮ঃ এই সাক্ষাৎকারের শেষে আপনার কি কিছু বলবার আছে?

আমি সকল মুসলিমকে জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান করছি। আর এটাই সম্মান আর বিজয়ের একমাত্র পথ। আগে মুসলিমরা মনে করতো যে পাশ্চাত্য আর আমেরিকার মুখোমুখি হওয়ার মত ক্ষমতা আমাদের নেই এবং আমরা কেবলমাত্র ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করতে পারি, তাদের নির্দেশ মেনে চলতে পারি। কিন্তু এখন তাদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে তারা দেখেছে যে, এই উম্মাহের ছোট ছোট দলগুলো বাস্তবিকই কিছু করতে সক্ষম। আমি তাদেরকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। আমি সমগ্র মুসলিম জাতি, তার নেতৃবৃন্দ, সৈন্যবাহিনী আর তার জনগণকে সম্বোধন করে বলছি, তালিবান আর আল-কায়েদা নিয়ে, উসামা আর আপনাদের যুবকদের নিয়ে গঠিত একটি দল যদি পশ্চিমা বিশ্ব আর তার নেতৃত্বকে কাঁপিয়ে দিতে পারে, তাহলে কি হবে যদি আপনারা সবাই জিহাদে পথে চলা শুরু করেন? যদি আপনারা সবাই মিলে একত্রে পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, কুফরী শক্তি কি কখনও আমাদেরকে নিয়ে খেলতে পারবে? এই প্রশ্ন আমি তাদেরকে করছি। আমি চাইছি তারা সেই পর্যন্ত দায়িত্বশীল হোক, যে পর্যন্ত কুরআন আর সুন্নাহ তাদেরকে নির্দেশ করেছে।

এই সাক্ষাৎকারের ইতি টানতে গিয়ে, আমরা আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদেরকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন আমাদের পক্ষ হতে এবং আপনার পক্ষ হতে আমাদের ন্যায়নিষ্ঠ কর্মগুলি কবুল করেন। এবং আমাদের সর্বশেষ দু'আ এই যে, সমস্ত প্রশংসা আর শোকরের একমাত্র হক আল্লাহর জন্য, যিনি সমস্ত দুনিয়ার মালিক। আর আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এবং তাঁর পরিবারের উপর এবং তাঁর সাহাবীদের উপর বর্ষিত হোক শান্তি, দু'আ আর রহমত। আল্লাহ আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

পরিবেশনায়

আল-ক্বাদিসিয়াহ মিডিয়া

মারকাজ সাদা আল-জিহাদ

গ্লোবাল ইসলামিক মিডিয়া ফ্রন্ট